অ্যালফ্রেড হিচকক
ভার্টিগো অবলম্বনে
অদ্রীশ বর্ধন
প্রেত প্রেয়সী

প্রেত-প্রেয়সী

অ্যালফ্রেড হিচককের
‘ভার্টিগো’ অবলম্বনে রচিত

.প্রত-প্রেয়সী

রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার

অদ্রীশ বর্ধন

ফ্যানট্যাস্টিক ও মন্তাজ
যৌথ প্রয়াস

অগ্রজপ্রতিম বরেণ্য সাহিত্যিক

শ্রীমনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নিরীক্ষামূলক রহস্যকাহিনির প্রতি যিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় দিয়েছেন

‘.প্রত-প্রেয়সী’ আলফ্রেড হিচককের অসাধারণ ছায়াছবি ‘ভার্টিগো’ অবলম্বনে রচিত। এ উপন্যাসের প্রতি ছত্রে তীব্র উৎকণ্ঠা আর শ্বাসরোধী রোমাঞ্চ; কারণ এ কাহিনি এক অনিন্দ্যসুন্দরী মোহিনীর— যার মৃত্যু হয়েছিল পরপর তিনবার!

মুখবন্ধ

'.প্রত-প্রেয়সী' একটি ফরাসি রোমাঞ্চ-কাহিনির কাঠামোয় রচিত। সে কাহিনির নাম 'D'entre les morts'। ইংরেজি ভাষায় একই কাহিনি 'দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড' নামে প্রকাশ পায়। রুপোলি পর্দায় গিয়ে আলফ্রেড হিচককের হাতে কাহিনিটি নতুন নাম নেয়—'ভার্টিগো'।

'প্রেত-প্রেয়সী' ১৯৬৫ সালের মে মাসে 'মাসিক রোমাঞ্চ'-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

অদ্রীশ বর্ধন

ভূমিকা

Le faux visage de la morte...
...D'ENTRE
LES MORTS
par
BOILEAU-NARCEJAC
ÉDITIONS DENOËL

Boileau
and Narcejac
The Living and
the Dead
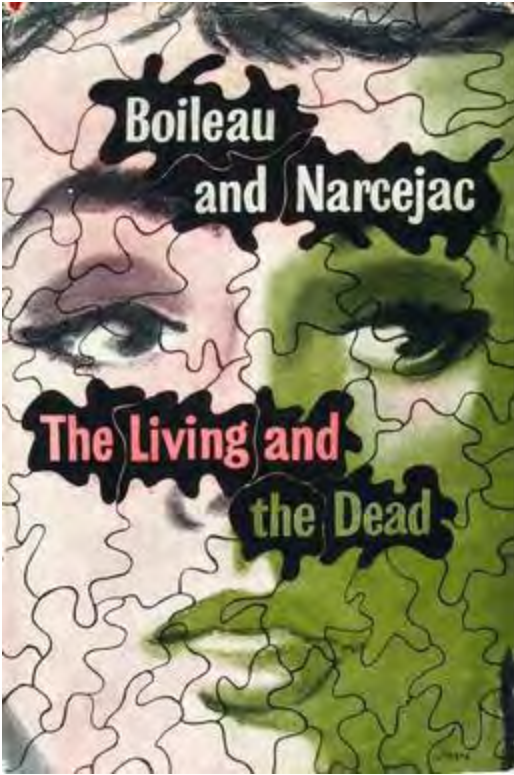
JAMES STEWART
KIM NOVAK
IN ALFRED HITCHCOCK'S
MASTERPIECE
'VERTIGO'

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
মাসিক
সম্পাদক • রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়
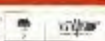
প্রথম খণ্ড

(১)

‘দুর্লভ, আমার .ীকে কিছুদিন চোখে চোখে রাখতে পারবে?’ হঠাৎ গম্ভীর গলায় শুধোলে মহেন্দ্র।

‘কেন বলো তো, পাখা গজিয়েছে নাকি?’ চোখ নাচিয়ে পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

‘বুঝলাম না।’

‘মানে, এদিক ওদিক ওড়বার সখ হয়েছে বুঝি?’

‘যা ভাবছ, তা নয়।’

‘তবে কী?’

‘বুঝিয়ে বলা শক্ত... কীরকম যেন হয়ে গেছে কস্তুরী।’

‘কী মুশকিল, কীরকম হয়েছে, তা তো বলবে?’

তবুও দ্বিধা করতে লাগল মহেন্দ্র। চোখ দেখে অনুমান করলাম, পাছে ঠাট্টা করি, এই ভয়ে মুখ খুলতে সাহস করছে না বন্ধুবর।

অথচ পনেরো বছর আগেকার কলেজ সহপাঠী মহেন্দ্রের সঙ্গে আজকের মহেন্দ্রের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। ওপরে ওপরে খুব মিশুকে হলেও ভেতরটা ছিল একেবারে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। আত্মকেন্দ্রিক আর লাজুক। একমাত্র আমিই চিনেছিলাম ওকে। সেই কারণেই দীর্ঘ পনেরো বছর পরে আমাকে পেয়ে ওর উল্লাস দেখে মোটেই অবাক হইনি।

এইভাবেই চিরকাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মহেন্দ্র। কিন্তু কোথায় যেন একটা খোঁচা থেকে গেছে ওর আজকের উচ্ছ্বাসে।

অন্তত, আমার তো তা-ই মনে হল। মনে হল, যেন বেশ কয়েকবার মহড়া দেওয়ার পর স্টেজে নেমেছে মহেন্দ্র। ক্লাইমাক্সে পৌঁছে যেন একটু অতি-অভিনয় করে ফেলেছে। তাই

ছটফট করছে, আঙুল মটকাচ্ছে অস্থির হাতে, হাসছে অস্বাভাবিক জোরে। কিছুতেই যেন সহজ হয়ে উঠতে পারছে না। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে মাঝের পনেরোটা বছর— কিন্তু পারছে কই?

কালের ছোঁয়া লেগেছে মহেন্দ্রের চেহারায়। মাথাজোড়া টাকের মরুভূমিতে লজ্জায় মুষড়ে পড়তে চাইছে কয়েকগাছি চুল। মাংসল ভারী থুতনিতে সে ধার আর নেই। ধোঁয়াটে ভুরু। নাকের পাশে অনেক অভিজ্ঞতার ক্ষীণ রেখা।

আর আমি? শুধু রোগাই হইনি। সেই বিপদটার পর থেকে একটু ঝুঁকে চলাটাও অভ্যাসে এসে গেছে। অস্বস্তি লাগছিল আরও একটা কথা মনে পড়ায়। আইন পড়েছিলাম স্রেফ পুলিশি কাজের জন্যে। অথচ কেন যে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিশ শুরু করেছি, এই প্রশ্নই যদি ফস করে জিজ্ঞেস করে বসে মহেন্দ্র, তাহলেই গেছি।

আমার কথার তক্ষুনি কোনও জবাব না দিয়ে সুদৃশ্য সিগার কেসটা এগিয়ে ধরলে মহেন্দ্র। বৈভবের ছাপ শুধু সিগার কেসে নয়, রয়েছে ওর মূল্যবান সুট আর আঙুলের একাধিক আংটির মধ্যেও।

গাল তুবড়ে আস্তে আস্তে মেজাজি ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'মুশকিল কিছু নয়, তবে এ হচ্ছে অ্যাটমস্ফিয়ারের প্রশ্ন।'

নাঃ, অনেক পালটে গেছে মহেন্দ্র। ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যে মোড়া এ-চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকালেই মনে হয়— এ সেই মানুষ, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস মিটিং-এ যাকে প্রধান আসন অলংকৃত করতে হয়, উঁচু মহলের রাঘব-বোয়ালের সঙ্গে যার দহরম মহরম অনেকের ঈর্ষার বস্তু, যার কৃপার ওপর নির্ভর করছে বহুশত পরিবারের অন্ন।

কিন্তু তবুও, আজ তার দৃষ্টি অস্থির, হাত চঞ্চল।

কণ্ঠে একবিন্দু শ্লেষ ঢেলে শুধোলাম, 'অ্যাটমস্ফিয়ার?'

'হ্যাঁ, অ্যাটমস্ফিয়ার। আপাতত এব চাইতে লাগসই শব্দ মাথায় আসছে না। না, না, সত্যিই আমার ওয়াইফ খুব সুখী। চার বছর হল বিয়ে হয়েছে আমাদের, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে গেলে যা-যা থাকা দরকার, তার কোনওটারই অভাব নেই। নিমতা গ্রামের নাম শুনেছ?'

'না তো।'

'বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নাম তো শুনেছ?'

'তা শুনেছি।'

'তারই মহিমা নিয়ে "বাঘ মঙ্গল" কাব্য লিখে যিনি যশস্বী হয়েছেন, নিমতা গ্রাম সেই কবিকৃষ্ণ দাসের জন্মস্থান। কিন্তু আজকের দিনে নিমতার নামডাক আমার ফ্যাক্টরির জন্যে। সুতরাং, আমার অভাবটা কোথায় বল?'

'ছেলেপুলে?'

'নেই। সে জন্যে কোনও দুঃখও নেই। শুধু এইটুকু বাদ দিলে মেয়েরা যা পেলে সুখী হয়, তার সবই পেয়েছে কস্তুরী। তা সত্ত্বেও বেশ বুঝছি কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে।'

'খুব গোমড়া স্বভাবের মেয়ে বুঝি?'

'মোটেই না। কখনও খুশিতে ডগমগ, আবার পরের মুহূর্তেই হয়তো মুখ কালো করে বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক কথায় মেজাজি। গত ক-মাসে আরও যাচ্ছেতাই হয়ে উঠেছে এই মেজাজ।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'একবার নয়, অনেকবার। কিন্তু সবাই এক রায়।'

'কী?'

'কিছুই হয়নি কস্তুরীর।'

'কিছু না হওয়াটা শুধু দেহের, না মনের?'

'দুয়েরই। বেয়াড়া কোনও লক্ষণ ধরা পড়েনি। অন্তত...'

বলতে বলতে অস্থির হাতে মটমট করে আঙুল মটকাল মহেন্দ্র। অকারণে কোটের ওপর থেকে চুরুটের ছাই ঝাড়ল কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, 'ডাক্তার যা-ই বলুক না কেন, আমি জানি কিছু একটা হয়েছে ওর। প্রথম প্রথম আমিও ভেবেছিলাম, শৈশবের কোনও বিভীষিকা থেকে এখনও হয়তো মুক্ত হতে পারেনি ওর নরম মন— তাই কোনও ভয় মৌরসী পাট্টা গেঁড়েছে নির্জ্ঞান মনে। লক্ষ করেছি, কথা বলতে বলতে আচমকা বোবা হয়ে গেছে কস্তুরী। এমনভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, যেন নিজের মধ্যে আর নিজে নেই। সত্যিই অদ্ভুত। একনাগাড়ে বকবক করেছি কানের পাশে, একবর্ণও শোনেনি। কখনও কখনও সাধারণ এক-একটা জিনিসের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বড় বড় চোখ মেলে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন বিশ্বদর্শন করছে।

একটা কথা বলি, হেসো না। এক-একবার মনে হয়েছে, এমন কিছু ও দেখতে পাচ্ছে, যা আমার চোখে অদৃশ্য। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে হতভম্ব চোখে তাকায় আশপাশে... যেন স্বামী, সংসারকে চিনি-চিনি করেও চিনতে পারছে না...'

সিগারটা নিভে গেছিল। ফস করে কাঠি জ্বালিয়ে আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল মহেন্দ্র। নীল-নীল ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমার পানে। এ দৃষ্টি আমি চিনি। শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে ঠিক এমনিভাবেই সামনের বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকত মহেন্দ্র।

বললাম, 'শরীর আর মন, দুই যদি সুস্থ থাকে, তাহলে, কিছু মনে কোরো না মহেন্দ্র, যা শুনলাম তা ন্যাকামো ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়েদের ছলাকলার তো অভাব নেই, নিশ্চয় কোনও মতলব—'

সিগার সমেত হাত তুলে মাঝপথেই আমাকে থামিয়ে দিলে মহেন্দ্র।

বললে, 'তা-ও ভেবেছি আমি। বেশ কিছুদিন চোখে চোখেও রেখেছিলাম। একদিন ও মোটর হাঁকিয়ে গেল কলকাতার বাইরে... ঘোষপাড়ায়...'

'ঘোষপাড়া আবার কোথায়?'

'কাঁচড়াপাড়া থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।'

'তারপর?'

'ঘোষপাড়ায় হিমসাগর নামে একটা দিঘি আছে। দিঘির পাড়ে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে জলের দিকে তাকিয়ে অবিকল পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল কস্তুরী।'

'দিঘির পাড়ে বসে থাকাটা কি অন্যায়?'

'অন্যায় নয়, তবে স্বাভাবিকও নয়। বলে বোঝাতে পারব না দুর্লভ। দিঘির পাড়ে আঘাটায় বসতে না বসতেই যেন পলকের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে গেছিল ও। ভোলবার নয় সেই অসাধারণ গাম্ভীর্য আর তন্ময়তা... হঠাৎ যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গুরুত্ব ভেসে উঠেছিল পদ্মপাতায় ঢাকা দিঘির জলে... ঘাটে মেয়েরা এসেছে, জল নিয়েছে, গা ধুয়েছে, কাপড় কেচেছে, কিন্তু ধ্যান ভাঙেনি কস্তুরীর। ওর তন্ময় দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়েছে যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'রাবিশ!'

'আমিও ভেবেছিলাম রাবিশ। কিন্তু প্রবাদটা তো ভাই ভুলতে পারছি না।'

‘প্রবাদ? এর মধ্যে আবার প্রবাদ এল কোত্থেকে!’

একতাল নীলচে ধোঁয়া ছাড়ল মহেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিলে না। কিলবিলে ধোঁয়ার জটের মধ্যে মুখটাও গলে গলে মিশে যাওয়ার উপক্রম হল।

‘কী হল? চুপচাপ কেন?’ শুধোই আমি।

‘বিশ্বাস করবে না, তাই বলতে ভরসা পাচ্ছি না।’

‘করব, করব, করব। শোনাও তোমার প্রবাদ-কাহিনি।’

থেমে থেমে বলল, ‘প্রবাদ, লোকে বলে হিমসাগরের জলে এক আশ্চর্য শক্তি আছে। এ জল চোখে দিয়ে একবার একজন অন্ধ দৃষ্টিলাভ করেছিল।’

‘তাতে তোমার কী?’

‘কস্তুরীও কি... মানে, তৃতীয় নয়ন বলে একটা কথা আছে তো...’

‘বুঝি না, কী করে এসব উদ্ভট কল্পনা তোমার মতো শিক্ষিত লোকের মাথায় আসে।’ বিরক্তি আর চাপতে পারি না আমি, ‘ওসব বাজে কথা ছেড়ে বল দিকি তারপর কী হল?

‘সেইদিন রাতেই কস্তুরীকে জিজ্ঞেস করলাম হিমসাগর দিঘিতে কেন গেছিল সে। জবাব শুনে বুঝলাম অবস্থা আরও গোলমেলে। সেদিন নাকি বাড়ির বাইরেই বেরোয়নি কস্তুরী। মুখ দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না যে কথাটা মিথ্যে।’

নাঃ, সেই মহেন্দ্রই বটে। মনের পর্দায় কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যেতে গিয়েও আবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল পুরোনো বন্ধুর ছবি। গল্পটাও জমেছে বেশ।

মুখে বললাম, ‘আমার মনে হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে যে খেলা খেলে এসেছে কুহকিনী মেয়েরা, তোমার স্ত্রীও তার স্বাদ পেয়েছে। অর্থাৎ, রঙ্গমঞ্চে আরও একজন পুরুষ রয়েছে।’

তর্জনির টোকা দিয়ে লম্বা চোঙার মতো সাদা ছাইটাকে ছাইদানির গহ্বরে নিক্ষেপ করে ম্লান হেসে বলল মহেন্দ্র, ‘আমি যা-যা ভেবেছিলাম, তুমি তার কোনওটিই বাদ দিচ্ছ না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, কস্তুরীর পক্ষে এরকম নোংরা কাজ সম্ভব। তা ছাড়া, স্রেফ মজা করার জন্যে নিশ্চয় কেউ কলকাতার বাইরে গিয়ে সেকেলে দিঘির পাড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের দিকে তাকিয়ে থাকে না।’

‘স্ত্রীর সঙ্গে এ সম্পর্কে কোনও কথা হয়নি?’

‘হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যাওয়ার সময়ে ঠিক কী ধরনের অনুভূতি মনে আসে।’

'কী বললেন উনি?'

'এ নিয়ে নাকি মিছিমিছি মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। স্বপ্ন নয়— মাঝে মাঝে এটা-সেটা ভাবে।'

'তোমার ধারণা কী?'

'অনেকদিন আগে কলেজ পালিয়ে একটা ইটালিয়ান ছবি দেখেছিলাম, মনে আছে তোমার?'

'কী ছবি বলো তো?'

'নামটা মনে নেই। প্রেততত্ত্ব নিয়ে তোলা ছবি। মিডিয়াম মেয়েটির ওপর প্রেতাত্মার ভর হয়েই গবগব করে অনেক কথা বলত। কিন্তু পরে আর কিছুই মনে থাকত না। কস্তুরীর মুখ দেখে সেই ইটালিয়ান অ্যাকট্রেসের মুখটি মনে পড়ে গেছিল আমার। অবিকল সেই রকম ভাব ফুটে উঠতে দেখেছি কস্তুরীর মুখেও। ফ্যালফেলে চাউনি— অনেকটা নেশায় বুঁদ মাতালের মতো।'

'আমার তো মনে হচ্ছে, নেশাটা তুমিই করেছ। এবার কি ভূতে পাওয়ার গল্প শুরু হবে?'

'জানতাম, এই কথাই বলবে তুমি। মনের সঙ্গে আমিও কম লড়িনি। কিন্তু—'

'পুজো-আচার অভ্যেস আছে তোমার স্ত্রীর?'

'আছে, তবে তেমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়।'

'হাত দেখানোর বাতিক?'

'কস্মিকালেও নেই। দুর্লভ, যা ভাবছ, তা নয়। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি নিয়ে পিটার হারকোস জমজমাট আত্মজীবনী লিখতে পারেন— কিন্তু এ ব্যাপার সেরকম কিছু নয়। মাঝে মাঝে কী যে হয়, হঠাৎ যেন পটটাই পালটে যায় চোখের সামনে।'

'পরিবর্তনটা ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায় তা—'

'লক্ষ করেছি। ইচ্ছার কোনও হাতই নেই বেচারির। অনেকদিন ধরে এ জিনিস দেখেছি বলেই এতটা জোরের সঙ্গে বলতে পারছি। স্বপ্নের ঘোরটা যখন আসতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী তা টের পায়... দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে... অন্য কোনও কাজ বা কথা নিয়ে মনটা ভরিয়ে রাখতে চায়... কখনও কখনও জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, জানলা খুলে দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়... ঠিক সেই সময়টিতে যদি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াই, তাহলেই

যেন হাতে স্বর্গ পায় বেচারি। বুঝতে পারি, ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠতে চাইছে ও। শেষ পর্যন্ত পারেও। কিন্তু যদি ইচ্ছে করে ওর দিকে মন না দিই, তাহলে আর সামলাতে পারে না নিজেকে।'

'তারপর।'

'বেসামাল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখের চেহারাও পালটে যায়। সমস্ত শরীর শক্ত করে একদৃষ্টে এমন কিছু দেখতে থাকে, যা স্থির নয়, যা ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছে একদিক থেকে আর একদিকে... সেই সঙ্গে ওর চোখেও ঘুরতে থাকে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নেয়। তারপর পাঁচ মিনিট থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে চলাফেরা করে।'

'অর্থাৎ ঘুমিয়ে হাঁটা?'

'ঘুমের ঘোরে হাঁটতে আমি কাউকে দেখিনি... কাজেই... তবে কস্তুরীকে দেখে মনে হয় না যে ঘুমিয়ে আছে। মনে হয় যেন কস্তুরীর মধ্যে আর কস্তুরী নেই... আর কেউ এসে ওর হাত-পা নাড়াচ্ছে, ওরই চোখ দিয়ে দেখছে। ভাবলেও হাসি পায়... কিন্তু... ঠিক... সেই মুহূর্তে কস্তুরী যেন আর একজন হয়ে যায়... আর একজন মানুষ... কস্তুরী নয়!'

সত্যি সত্যি উৎকণ্ঠার মেঘ ঘনিয়ে ওঠে মহেন্দ্রের চোখে।

একটু ধমকের সুরেই এবার বলি, 'আর একজন মানুষ! লোকে বুজরুক ঠাউরাবে যে!'

'জানতাম। তুমি যে বিশ্বাস করবে না, তা জানতাম। কিন্তু এমন অনেক জিনিস, মানে, কতকগুলো অলৌকিক প্রভাব আছে যা...'

কথাটা শেষ করতে পারল না মহেন্দ্র। ছাইদানির কিনারায় সিগারটা নামিয়ে রেখে অস্থিরভাবে এমন জোরে আঙুল দিয়ে আঙুল জড়িয়ে ধরলে যে গাঁটগুলোসুদ্ধ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

বলি-বলি করেও এতক্ষণ যা মুখে মানতে পারছিল না মহেন্দ্র, এবার আর তা বাধা মানল না, 'দুর্লভ, শুরু যখন করেছি, তখন সব খুলেই বলি। কস্তুরীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে উমা দেবী নামে একজন রহস্যময়ী মহিলা ছিলেন। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই ইনি শূন্যের সঙ্গে কথা বলতেন, গরগর করে অতীত-ভবিষ্যৎ বলে যেতেন, এমনকী শুধু হাত বুলিয়ে নাকি অনেকের পুরোনো ব্যারামও সারিয়ে দিতেন।'

'কোন সালের কথা বলছ?'

'ষোড়শ শতাব্দীর। সালটা মনে নেই। উমা দেবীর এই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীও আসতেন তাঁর কাছে। মেয়ের মতিগতি দেখে বাড়ির লোকেরা তো মহাচিন্তায় পড়লেন। শেষকালে উমা দেবীও সন্ন্যাসিনী না হয়ে যান। উনি নিজেও সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন— তার কারণও ছিল। ত্রিকালদ্রষ্টা হিসেবে ওঁর অদ্ভুত ক্ষমতার গল্প ডালপালা মেলে ছড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে দেবীর মতো শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন উনি। এদিকে বিয়ের বাজারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিলেন অভিভাবকেরা। শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দেওয়ার পর অপ্রত্যাশিতভাবে উমা দেবীকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এক গৃহী-সন্ন্যাসী। বিয়ের পর একটা বাচ্চাও হয়েছিল। তারপরেই কী এক অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেন উমা দেবী।'

এসব কাহিনি আমার ভালোই লাগে। মহেন্দ্র থামতেই শুধোলাম, 'কর্তাভজা সম্প্রদায়টা আবার কী হে?'

'আউলচাঁদ নামে এক সাধু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অন্তর্ধান করার বহুকাল পরে নাকি আবার আউলচাঁদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, 'গুরু সত্য', এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। এ সম্বন্ধে ভারী ইন্টারেস্টিং একটা কিংবদন্তি আছে। তোমার ধৈর্য থাকলে শোনাতে পারি।'

নড়ে চড়ে বসে বললাম, 'শোনাও।'

'কস্তুরীর এই সব উপসর্গ দেখা-যাওয়ার পর থেকেই এ সম্বন্ধে আমি অনেক খোঁজখবর নিয়ে এত কথা জেনেছি। জনশ্রুতি যে, উলা অর্থাৎ বীরনগর নিবাসী মহাদেব নামে জনৈক বারুজীবী ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার তাঁর পানের বরজের মধ্যে এক অজ্ঞাতকুলশীল সুদর্শন বালককে দেখতে পান। মহাদেব তাকে ঘরে এনে ছেলের মতোই মানুষ করেন— নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। মহাদেবের যত্নে পূর্ণচন্দ্র হরিহর নামে জনৈক বৈষ্ণবের কাছে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আর ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিশ বছর বয়েসে শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় গিয়ে বলরাম দাসের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তখন থেকেই তার নাম হয় আউলচাঁদ। কর্তাভজাদেরকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটা শাখা বলতে পারো। নিজের ধর্মকে এঁরা সত্যধর্ম বা সহজ ধর্ম বলে থাকেন। এঁদের মতে কর্তা বা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। আর, গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। গুরুদেরকে বলা হয় 'মহাশয়',

শিষ্যদের ‘বরাতি’। সম্প্রদানের সাধন বিষয়ে কতকগুলো গুঢ়-রহস্য আছে, যা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না।

‘লোকে বলে, আউলচাঁদের বাইশ জন শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে রামশরণ পাল আউলচাঁদের মৃত্যুর পর গুরুর পদ পান। এখনও তাঁর বংশধরেরাই ঘোষপাড়ায় থেকে এই সম্প্রদায় পরিচালনা করেন। রামশরণের স্ত্রী খুব ধর্মপরায়ণা ছিলেন। শিষ্যরা তাঁকে ‘সতীমা’ বলে ডাকত। একবার নাকি কঠিন অসুখে মারা গিয়েছিলেন তিনি। তখন আউলচাঁদ কাছের একটা পুকুর থেকে খানিকটা মাটি নিয়ে তাঁর গায়ে মাখিয়ে দিতেই তিনি বেঁচে উঠেছিলেন।’

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। মহেন্দ্র থামতেই শুধোলাম, ‘রিয়ালি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এর সঙ্গে উমা দেবীর কী সম্পর্ক? আর, উমা দেবীর সঙ্গেই বা তোমার স্ত্রীর সন্দেহজনক গতিবিধির কী সম্বন্ধ?’

‘সম্পর্ক আছে ভাই, না থাকলে কি এত কথা বলি তোমাকে? ঘোষপাড়া ডালিম তলায় ‘সতীমা’-র সমাধিস্থান আজও একটা দেখবার মতো জায়গা। রামশরণেরই এক শিষ্যকে বিয়ে করেছিলেন উমা দেবী। আত্মহত্যার পর তাঁকেও সমাধিস্থ করা হয়েছে এই ঘোষপাড়ায় হিমসাগর দিঘির পাড়ে— যে দিঘির মাটি মাখিয়ে ‘সতীমা’-কে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন আউলচাঁদ।’

বন্দুকের বুলেটের মতোই শেষের কথাগুলো গেঁথে গেল মনের মধ্যে। কোনও কথাই বলতে পারলাম না আমি।

ফিসফিস করে মহেন্দ্র বললে, ‘দুর্লভ, পঁচিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন উমা দেবী। একটু থেমে, ‘কস্তুরীর বয়স এখন পঁচিশ বছর!’

হঠাৎ ঘরের ঘড়িটাও বুঝি থমকে দাঁড়িয়ে যায়। থমথমে হয়ে ওঠে ঘরের বাতাস। দু-জনেই নিশ্চুপ। মনে মনে সমস্ত কাহিনিটা সাজিয়ে নিয়ে শুধোলাম, ‘তোমায় স্ত্রী নিশ্চয় জানেন... মানে, উমা দেবীর কাহিনি নিশ্চয় তাঁর অজানা নয়?’

‘না, ও জানে না। এ ইতিহাস আমি শুনি শাশুড়ির মুখে। বিয়ের পরেই উনি বলেছিলেন। তখন অবশ্য কোনও গুরুত্ব দিইনি এসব কথায়... না শুনলে মনে কষ্ট পাবেন, তাই মন দিয়ে সবই শুনেছিলাম। শাশুড়ি মারা গেছেন অনেকদিন।’

‘একটা প্রশ্ন। শাশুড়ির অন্য কোনও মতলব ছিল কি না জানো?’

‘কথায় কথায় হঠাৎ এ প্রসঙ্গ উঠেছিল। তবে উনি বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন আমায়— এ ইতিহাস আমি যেন কোনওদিন কস্তুরীকে না শোনাই। মেয়েকে তিনি চিনেছিলেন। হাড়ে হাড়ে— মনের সুস্থতা সম্বন্ধেও বোধহয় সন্দেহ একটু ছিল।’

‘কিন্তু যাঁর এত হাঁড়ির খবর রাখা হয়েছে, তাঁর আত্মহত্যার কারণ অজানা রইল, এটা কেমনতরো কথা।’

‘কারণ নাকি কেউ খুঁজে পায়নি। বাইরে থেকে যতদূর মনে হয়, খুবই সুখে ছিলেন তিনি। ছেলের মা হয়েছিলেন মাত্র মাস কয়েক আগে। তারপরেই আচমকা একদিন...’

‘সবাই বুঝলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্কটা যে কোথায়, তা তো মাথায় আসছে না।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহেন্দ্র। বলল, ‘সম্পর্কটা এখুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে বহু অলঙ্কার পেয়েছিল কস্তুরী। পুরুষানুক্রমে পাওয়া এই সব জড়োয়া গয়নার মধ্যে আছে একটা পদ্মরাগ মণির নেকলেস।’

‘পদ্মরাগ মণির নেকলেস?’

‘হ্যাঁ, খুবই মূল্যবান জিনিস। তার চেয়েও বেশি এর পারিবারিক গুরুত্ব। নেকলেসটি উমা দেবীর। কী কারণে এক জমিদার গৃহিণী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। নেকলেসের প্রতিটি পদ্মরাগ মণির মধ্যে কস্তুরী কী দেখেছে জানি না, দিন নেই, রাত নেই, একদৃষ্টে মণিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ও। উমা দেবীর একটা পুরোনো অয়েল পেন্টিংও আছে বাড়িতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ছবির সামনে চুপচাপ বসে থেকেছে কস্তুরী। শুধু তা-ই নয়, একবার তো চমকে উঠেছিলাম ওর কাণ্ড দেখে। আয়নার পাশেই ছবিটা খাড়া করে রেখে পদ্মরাগ নেকলেস গলায় ঝুলিয়ে উমা দেবীর মতোই বিশেষ কায়দায় খোঁপা বাঁধছিল...’

কুয়াশা ঘনিয়ে ওঠে মহেন্দ্রের উদ্বেগ আঁকা চোখে। থেমে থেমে শেষ করে ও, ‘তারপর থেকেই ওই একই কায়দায় খোঁপা বেঁধে আসছে কস্তুরী। পিঠের ওপর নয়, এ খোঁপা ঝুলতে থাকে বাঁ দিকের কাঁধের ওপর।’

‘উমা দেবীর সঙ্গে ওঁর চেহরার কোনও মিল আছে?’

মিল... তা একটু আছে... খুঁটিয়ে দেখলে ধরা যায়। খুবই অস্পষ্ট।’

‘তাহলে আর একটা প্রশ্ন করি, তোমার আসল ভয়টা কীসের। তা বলবে কি?’

সিগারটা তুলে নিয়ে অন্ধকার-মুখে ছাই-জমা ডগার দিকে তাকিয়ে রইল মহেন্দ্র।

বলল, 'স্পষ্ট করে বলা মুশকিল... তবুও বলব, একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে। দুর্লভ, কস্তুরী আর আগের মতো নেই... আর... আর মাঝে মাঝে কেবলই মনে হয় —'

'কী?'

'যে মেয়েটির সঙ্গে ঘর করছি, সে কস্তুরী নয়।'

সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম, 'ধীরে, বন্ধু ধীরে! যদি স্ত্রী-ই না হন, তবে কে উনি? উমা দেবী? মাই ডিয়ার মহেন্দ্র, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?... ড্রিঙ্ক করো নিশ্চয়? কী খাবে? হুইস্কি? রাম? জিন? না, না, যা ভাবছ, তা নয়। পাঁড় মাতাল আমি নই। তবে মাঝে মাঝে সুরাস্বাদ গ্রহণ করাকে দোষের মনে করি না।'

'জিন উইথ লাইম।'

পাশের ঘরে কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়েছি, পেছন থেকে শুধোলে মহেন্দ্র, 'নিজের গাওনা গাইতে গিয়ে তোমার খবরই জিজ্ঞেস করা হয়নি। বিয়েশাদি করেছ?'

'না।'

'কেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে শুধোলাম, 'গভর্নমেন্টের ওয়ার কনট্রাক্ট ধরেছ নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ। ইস্পাতের।'

দুটো গেলাস ভরে নিয়ে বললাম, 'যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ! কান ঝালাপালা হয়ে গেল যুদ্ধের পাঁয়তারা শুনতে শুনতে। ওদিকে তো সুভাষ বোস উঠে পড়ে লেগেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়তে... হিয়ার ইজ লাক, মহেন্দ্র।'

'অল দ্য বেস্ট, দুর্লভ।'

গেলাস তুলে দু-জনে তাকালাম দু-জনের চোখের পানে। মাথায় একটু খাটো হলেও গায়ে-গতরে দিব্বি ভারী হয়েছে মহেন্দ্র। হবেই বা না কেন, টাকায় গড়াগড়ি দিলে চামচিকেও হাতি হতে পারে। এই যুদ্ধেই কোটিপতি হয়ে যাবে মহেন্দ্র... কিন্তু আমার মনে ঈর্ষা কেন?

গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম টেবিলের ওপর।

শুধোলাম, ‘এমনও তো হতে পারে যে কোনও নিকট আত্মীয়ের হাতে সম্পত্তি যাওয়ার ভয়ে উদ্বিগ্ন তোমার স্ত্রী?’

‘দূর সম্পর্কের কয়েকজন ভাইটাই আছে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ হয় না আমাদের।’

‘তোমাদের বিয়েটা হল কীভাবে?’

‘অ্যাকসিডেন্টালি, খুবই রোমন্টিকভাবে।’

‘কীরকম?’

‘কারবার সূত্রে বোম্বাই গিয়েছিলাম। আলাপ হয়েছিল হোটেলে।’

‘কোন হোটেলে?’

‘সি ভিউ।’

‘বোম্বাইতে উনি গিয়েছিলেন কেন?’

‘ছবি আঁকা শিখতে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট।’

‘চাকরির মতলব ছিল বুঝি?’

‘না, না। বড়লোকের মেয়ের অনেক খেয়াল থাকে, এও তা-ই। আঠারো বছর বয়সে নিজের নামে যে গাড়ি কেনে, তার কি চাকরির দরকার হয়? আমার শ্বশুর তো নামকরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।’

কথা বলতে বলতে গেলাস হাতে পায়চারি করছিল মহেন্দ্র। পা ফেলা আর কথা বলার মধ্যে ফুটে উঠছে গভীর আত্মবিশ্বাস যা তার কোনওদিনই ছিল না। ছাত্রজীবনে আড়ষ্ট চলাফেরা আর মাঝে মাঝে তোতলামোর জন্য কতই না টিটকিরি সহ্য করতে হয়েছে। আজ আর সে-সবের চিহ্নমাত্র নেই। সত্যিই, বিয়ে করে কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে মহেন্দ্র।

জিজ্ঞেস করি, ‘ঝগড়াটগড়া কিছু হয়েছিল? অথবা কোনও খারাপ খবর? মেয়েদের মন তো খুব নরম, হয়তো...’

‘না। অনেক ভেবেছি, সেরকম কিছুই পাইনি। তবে...’

‘তবে কী?’

‘হপ্তার বেশির ভাগ দিনই তো নিমতায় থাকতে হয় আমাকে। কাজেই—’

‘আচ্ছা, বাড়ির বাইরে থাকো বলেই কি এই সব লক্ষণ?’

'আমার তা মনে হয় না। প্রথম অ্যাটাকের পরেই তা বুঝেছিলাম। সেদিন ছিল শনিবার। বাড়ি ফিবে দিব্বি হাসি খুশি মেজাজে দেখলাম কস্তুরীকে। কিন্তু রাতের দিকে মেজাজ দেখে খটকা লাগল।'

'তার আগে?'

'মাঝে মাঝে একটু মুডি থাকত বটে— তবে তা আর পাঁচজনের মতোই— বাড়াবাড়ি কিছু নয়।'

'কিন্তু সেই শনিবারে খটকা লাগল নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলে বলে?'

'ঠিক সেরকম কিছু না হলেও স্বাভাবিক মনে হয়নি ওকে।'

'তুমি থাকো কোথায়?'

অবাক হয়ে তাকাল মহেন্দ্র। তারপর হেসে ফেলল।

'ভুলেই গেছিলাম যে, দেড় যুগ পরে দেখা হল আমাদের। নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছি। এই নাও কার্ড। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন দুর্লভ? হীরামন পাখি না পেলে বিয়ে করব না টাইপের কোনও পণ-টন নেই তো?'

কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই শনিবারে বাড়ি আসার পর কী-কী হয়েছিল, সব বলো।'

'বাড়ি ফিরেছিলাম সকাল দশটায়। খেয়েদেয়ে টেনে ঘুম দিলাম। দুপুর তিনটে নাগাদ বেরোলাম দু-জনে। সেক্রেটারিয়েটে আমার একটু দরকার ছিল; সেখান থেকে গেলাম চৌরঙ্গী। ফিরপোতে কিছুক্ষণ বসার পর... এক কথায়, এমন একটা মিষ্টি বিকেল— বিয়ে না করা পর্যন্ত যার স্বাদ তুমি বুঝবে না।'

'অসঙ্গতিটা লক্ষ করলে কখন?'

'রাত্রে— খাবার পর।'

'তারিখটা মনে আছে?'

'সে কী হে! তা-ই কি কারও থাকে?'

তবুও ক্যালেন্ডারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল মহেন্দ্র, 'মাসটা যে ফেব্রুয়ারি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারিখটা ছিল মাসের শেষের দিকে... এই তো শনিবার... ছাব্বিশ তারিখ।'

মহেন্দ্রের সামনে এসে চোখে চোখ রেখে শুধোলাম, ‘এত লোক থাকতে আমার কাছে আসার কারণ কী?’

আবার হাত কচলাতে শুরু করল মহেন্দ্র। সেই পুরোনো বদভ্যাস। সব গেছে— এটাই শুধু যায়নি।

বিড়বিড় করে বলল মহেন্দ্র, ‘ছাত্রজীবনে তুমি ছিলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তা ছাড়া, আমি তো জানি, সাইকোলজি তোমার বিশেষ সাবজেক্ট। আর, এ-ব্যাপার নিয়ে পুলিশের কাছে কি যাওয়া যায়?’

আমি ভুরু কুঁচকোতেই তাড়াতাড়ি শেষ করলে মহেন্দ্র, ‘পুলিশের কাজ তুমি ছেড়ে দিয়েছ শুনেই ছুটে এলাম তোমার কাছে।’

সোফার পিঠে টোকা মারতে মারতে বললাম, ‘সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি... কিন্তু কেন জানো?’

‘না।’

‘আজ হোক, কাল হোক, জানতে পারবে। এসব কথা তো ধামাচাপা থাকে না।’

একটু হাসতে পারলে বাঁচতাম। মনের ওপর জোর যে কতখানি, তা দেখানোর জন্যেই এখন একটু ফিকে হাসির দরকার ছিল। কিন্তু পারলাম কই? শেষের ওই ক-টি শব্দের মধ্যেই তো বেজে উঠল তিক্ত সুর।

বললাম, ‘এক ব্যাটা জালিয়াতের সঙ্গে... একটু জিন দিই?’

‘না। থ্যাঙ্ক ইউ।’

‘বস্তাপচা গল্প। আমি ছিলাম ডিটেকটিভ। ডিগ্রি থাকুক আর না-থাকুক, পুলিশের খাতায় নাম লেখালে হেন কাজ নেই যা করতে হয় না। কোনওদিনই ভালো লাগেনি কাজটা। বাবা উন্নতি করেছিলেন এ-লাইনে— কাজেই আমাকেও ঘাড় মুচড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। যাক গে সে কথা... বাগবাজারের এক জালিয়াতকে অ্যারেস্ট করার ভার পড়েছিল আমাদের দু-জনের ওপর। অনেক কষ্টে হদিশ বার করলাম আমি আর ইসমাইল। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছিল। সে ব্যাটা ওপর তলার ঢালু টালির ছাদের একদম শেষে একটা খুঁটি আঁকড়ে বসেছিল... এমন জায়গায় বসেছিল যে... ইসমাইল ছেলেটিও বড় ভালো ছিল... ওরকম ছেলে...’

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে নামিয়ে রাখলাম। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। খুকখুক করে কেশে নিয়ে শুরু করলাম আবার, 'দেখলে তো? যতবারই বলি এই গল্প, ততবারই এই রকম হয়। মনে হয় যেন, পা-পিছলে পড়ে যাচ্ছি আমি... ঢালু টালির ছাদের একদম কিনারায় খুঁটি আঁকড়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছিল সে। অনেক নীচে বড় রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। তা ছাড়া খুব বিপজ্জনকও ছিল না লোকটা। কাজেই, একটু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে কলার ধরে টেনে আনলেই ল্যাটা চুকে যেত। কিন্তু আমি তা পারলাম না... কিছুতেই পারলাম না।'

'মনে পড়েছে,' বললে মহেন্দ্র, 'ছোটবেলা থেকেই খুব উঁচুতে উঠলে মাথা ঘুরত তোমার — নীচের দিকে তাকাতেই পারতে না।'

'আমার ওই অবস্থা দেখে ইসমাইলই এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটু পা পিছলে যেতেই আর সামলাতে পারলে না... আছড়ে পড়ল বড় রাস্তায়।'

'ইশ!'

কার্পেটের ওপর চোখ নামিয়ে বসে রইল মহেন্দ্র। মুখ দেখে বুঝলাম না, ওর মনের ভাবটা কী।

'আমি—'

'এরকম অবস্থায় নার্ভ ফেল করা স্বাভাবিক।' মুখ তুলে বললে মহেন্দ্র।

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর, 'কিন্তু বন্ধুর পা পিছলে যাওয়ার জন্যে তো তুমি দায়ী হতে পারো না।'

প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'ধরো।'

প্রত্যেকবারই এইরকম না-উপলব্ধি-করা অবিশ্বাসের সামনে পড়তে হয়েছে আমাকে, কেউ গুরুত্ব নিয়ে শোনেনি। কিন্তু কী করে শোনাই সেই ভয়ংকর চিৎকার? শূন্যের মধ্যে দিয়ে ওলোট-পালোট খেয়ে সবেগে নেমে চলেছে ইসমাইলের দেহ... বুকফাটা অন্তিম চিৎকারে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে আকাশ বাতাস... ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে রক্ত-হিম-করা সেই বিকট আর্তধ্বনি... তারপরেই পাষাণের বুকে অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা আছড়ে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ।... হয়তো, হয়তো মহেন্দ্রের স্ত্রীও এই ধরনের কুরে কুরে খাওয়া কোনও বিভীষিকা নিয়ে ভুগছেন... উনিও কি স্বপ্নে সেই রকম রক্ত-জমানো চিৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন?

‘তাহলে তোমার হেল্প পাচ্ছি?’ শুধোয় মহেন্দ্র।

‘কী করতে হবে আমাকে?’

‘বউয়ের ওপর একটু নজর রাখতে হবে। তার চাইতেও বড় কথা, এ-সম্পর্কে তোমার কী অভিমত, তা শুনতে চাই।’

‘কিন্তু আমাকে দিয়ে কোনও সাহায্য কি হবে?’

‘সে চিন্তা আমার... আজ রাতে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?’

‘আছে। কেন?’

‘ভেবেছিলাম, রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করব। যাক, আর একদিন হবে।’

‘না, না, আমি চাই না আমাকে চিনে ফেলেন উনি, তাতে অসুবিধে হবে কাজের।’

‘কিন্তু ওকে তুমি চিনবে কী করে?’

‘সিনেমায় নিয়ে যাও।’

‘মতলব ভালোই। কাল আমরা নিউ-এম্প্যায়ারে যাচ্ছি। বক্সে। ইভিনিং শো।’

‘ঠিক আছে। আমিও যাব।’

‘দুর্লভ,’ দু-হাতে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললে মহেন্দ্র, ‘তুমি যে, কী উপকার করতে চলেছ আমার, তা ভাষায় কোনওদিন প্রকাশ করতে পারব না।’ তারপর পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে, ‘তোমাকে অফেন্ড করতে চাই না, কিন্তু সম্মান-দক্ষিণা নিয়ে এখনও কোনও কথা হয়নি। অবশ্য তুমি যা করবে, তার তুলনায়—’

‘এখন থাকুক,’ বলি আমি, ‘কেন জানি মনে হচ্ছে, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোথাও একটা মিল রয়েছে। তাই জল-ঘুলিয়ে আমি দেখতে চাই, কী লুকোতে চাইছেন উনি।’

‘কিছুই লুকোচ্ছে না।’

‘দেখা যাক।’

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল মহেন্দ্র। নামতে নামতে পেছন ফিরে হাসি-মুখে বিদায় অভিবাদন জানালে দু-বার। ঘরে ফিরে এলাম আমি। জানলার পাল্লা খুলে দিয়ে নীচে তাকাতেই চোখে পড়ল গাড়িটা। মস্ত গাড়ি। কুচকুচে কালো রং। কী গাড়ি? জাগুয়ার? প্লিমাউথ? উপর থেকে বোঝা মুশকিল। নিঃশব্দে যেন তেলের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে রাস্তার মোড়ে উধাও হয়ে গেল বিশাল যন্ত্রযান... কস্তুরী... নামটা ভারী মিষ্টি। খুব নরম সঙ্গীতের মতো... হালকা ছন্দ লুকোনো আছে এ-নামে। কিন্তু কাঠখোট্টা এই লোকটাকে

দেখে এ-মেয়ে মজলো কী করে? আশ্চর্য? ভেতরটা যার একেবারেই ফোঁপড়া... না আছে পৌরুষ, না আছে জ্ঞান-চকমিকির ঝিকিমিকি... তাকে দেখে এমন সুন্দর নামের মেয়েও প্রেমে পড়ে? অন্য কারও সঙ্গে তলে তলে মন দেওয়া-নেওয়া ছিল নিশ্চয়, তা না হলে মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে যাওয়ার মানেটা কী?... ঠিক হয়েছে... ঐশ্বর্যের ছটা তার চলনে-বলনে... এমনি শাস্তিই তার প্রাপ্য। লোক-দেখানো এত আত্মবিশ্বাসওয়ালা লোকদের কী জানি কেন সহ্য করতে পারি না আমি... হয়তো আমার তা নেই বলেই।

খিঁচড়ে গেছিল মেজাজটা। দড়াম করে জানলা বন্ধ করে ফিরে এলাম ঘরে। টিন থেকে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে চিবুতে চিবুতে আরও একটু জিন ঢেলে নিলাম গেলাসে। রেডিয়ো চালিয়ে দিয়ে এসে বসলাম চেয়ারে। খবর বলার সময় হয়েছে... সেই একই খবর, হিটলারের পদভারে মেদিনী কম্পিত। ঘর অন্ধকার করে মাঝে মাঝে আরও একটা খবর আমি শুনতাম... আইএনএ রেডিয়ো থেকে প্রচারিত খবর...

কয়েক ফোঁটা বিটার ঢেলে দিয়ে চুমুক দিলাম গেলাসে। পুলিশের কাজে ব্যর্থ হলেও চাকরির জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরিনি আমি। অথচ... ড্রয়ার টেনে একটা লাল লেফাফা বার করে ডান দিকের ওপরের কোণে ছোট করে লিখলাম, ‘ডোসিয়ার, মহেন্দ্র কৌশিক’।

(২)

ঘাড়টা একটু .ঘারালেই চোখে পড়ে মহেন্দ্রকে। বক্সের কিনারায় দু-হাত ভাঁজ করে বসেছিল ও। ঠিক পিছনেই কস্তুরী। ছিপছিপে একহারা চেহারা, হাতির দাঁতের মতো ধবধবে মুখশ্রী। দূর থেকে চোখমুখ স্পষ্ট না দেখা গেলেও একটুকরো মিষ্টি রূপ যে সেখানে বসে রয়েছে, তা বুঝতে দেরি হয় না। একমাথা কালো চুলের মাঝে ফুরফুরে পাতলা মুখটি মেঘের বুকে বিদ্যুতের মতোই তীক্ষ্ণ, প্রদীপ্ত। আশ্চর্য, এমন গরিমা মাখানো আভিজাত্যে মোড়া রূপসী মেয়েকে বধূরূপে পেল কী করে মহেন্দ্র?

শুরু হল ছবি, প্রাণ পেল রুপোলি পর্দা— আমার মন কিন্তু নিমেষে অন্তর্হিত হল সেই পুরোনো দিনগুলিতে। আমি আর মহেন্দ্র দু-জনেই ছিলাম টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। লাজুক আর আড়ষ্ট। সহপাঠিনীরা ঠাট্টা করত, মুখ বুজে সহ্য করতাম দু-জনে। কাছে সরে আসতে পেরেছিলাম বোধহয় সেই কারণেই!

আর আজ?— আমি যা ছিলাম, তার চাইতে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছি। আর মহেন্দ্র...

কিন্তু এত সাহস পেল কোত্থেকে ও? আর কস্তুরী? হঠাৎ সমবেদনায় মন ভরে ওঠে আমার। মনে হল, যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীরের একদিকে রয়েছে মহেন্দ্র। অপরদিকে আমি আর কস্তুরী।

আচ্ছা, সি ভিউ হোটেলে যদি মহেন্দ্রের বদলে আমার সঙ্গেই আলাপ হত কস্তুরীর? সারি সারি সুখময় কল্পনা ভেসে ওঠে মনের পটে... একসঙ্গে খাওয়া... বেড়ানো... হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা...

চোখ খুলে নড়েচড়ে বসলাম কুশন-আঁটা চেয়ারে। হল ছেড়ে এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে ভালো হত। কিন্তু সে সাহসও আমার নেই। এতগুলো লোককে বিরক্ত করে

বেরোনোর চাইতে বরং... ঘাড় ফেরাতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না। তাই চোখের কোণ দিয়ে দেখি, একইভাবে ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে কস্তুরী। আলো চমকাচ্ছে কান আর গলার রত্নখচিত আভরণে। বুঝি চোখেও। মাথা কাত করে নিষ্কম্প দেহে বসেছিল যেন পাথরের ভেনাস। ভারী খোঁপাটা রয়েছে একদিকে কাঁধের ওপর— পিঠের ওপর নয়। বিচিত্র ফ্যাশন!

ঘাড়টা বোধ করি একটু বেশিই ঘুরিয়ে ফেলেছিলাম। পাশের ভদ্রলোক বিরক্ত মুখে তাকাতেই এতটুকু হয়ে গেলাম আমি। আর না, এবার বেরোতে পারলেই বাঁচি।

আচ্ছা, যে মেয়ে বিয়ে করে অসুখী, সে যদি সুখের সন্ধানে অন্য প্রণয়ী খোঁজে তাতে দোষের কী? কস্তুরীর কাছেও হয়তো এটা একটা ব্যসন। তা-ই যদি হয়, তাহলে... ভাবতেই মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে।

আগের মতোই রোশনাই ছড়াচ্ছে কস্তুরীর রত্নখচিত ইয়ার রিং। যেন একটি অপরূপ সুন্দর ফোটোগ্রাফ। অভাব শুধু এককোণে একটি স্বাক্ষরের। মনের চোখে এবার সইটাকেও দেখতে পাই দুর্লভ সামন্ত।

নাঃ, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনকে আমি বাঁধি কী করে? পেরেছি কি সেই ঢালু ছাদ, ভিজে টালি আর অনেক নীচে যানবাহনের গুমগুম ধ্বনিকে ভুলতে? অস্থির হয়ে ওঠে আঙুলগুলো— অনেকটা মহেন্দ্রের মতোই।...

মনের অলিন্দে আনাগোনা করল আরও কত লাগামছেঁড়া উদ্ভট চিন্তা। তারপরেই দপ করে জ্বলে উঠল আলো। ছবি শেষ।

ভিড়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছলাম দরজার কাছে। সিঁড়িতে লোক জমে গেছে। বক্স থেকে বেরিয়ে এল সস্ত্রীক মহেন্দ্র। কস্তুরীর একদম গা ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম আমি। খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম চোখ-মুখ-কান-নাক।

ব্ল্যাক আউট রাত। যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা। অন্ধকারের ঘোমটা নামিয়ে ভয়ার্ত নগরী অপেক্ষা করছে শত্রুপক্ষের বিমান বহরের। মাথা নিচু করে হেঁটে চললাম আমি।

কস্তুরী— মৃগনাভির মতোই যার সৌরভ শত যোজন দূর থেকে আকুল করে তোলে সৌন্দর্যপিয়াসীর হিয়াকে। যার ভ্রমরকৃষ্ণ চাহনিতে মেঘ-মল্লারের সব মিড়গুলো আর্ত হয়ে ওঠে পথহারা— সেই কস্তুরী সত্যই কি মহেন্দ্রের স্থূল সাহচর্যে সুখী হতে পেরেছে? এমন মেয়ের পেছনে ফেউয়ের মতো না লেগে থেকে যদি পারতাম হাতে হাত দিয়ে—

কিন্তু এ কী! আবার সেই চিন্তা! শেষে কি বিশ্বাসহন্তার মতো বন্ধুস্ত্রীর প্রেমে ডুবতে হবে!

মন খারাপ হয়ে যায় বিরক্তি আর গ্লানিতে। দ্রুত পা চালাই ফ্ল্যাটের দিকে।

নাঃ, কালকেই মহেন্দ্রকে ফোনে জানিয়ে দিতে হবে, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। পনেরো বছর যার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ছিল না, তার কাসুন্দি ঘাঁটতে গিয়ে খামোকা অশান্তি ডেকে আনতে আমি চাই না।

ভালো ঘুম হল না রাত্রে। সকালে উঠেই মনে পড়ল আজ কস্তুরীর পিছু নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে যায় মনটা। এ কী বিপদ! কিছুতেই কি রেহাই নেই এই উটকো চিন্তার খপ্পর থেকে? জোর করে ঘুরিয়ে দিলাম রেডিয়োর নবটা। যুদ্ধের খবর। সারা পৃথিবীতে বাজছে রণদামামা। টুথব্রাশ নিয়ে ঢুকে পড়লাম বাথরুমে।

দুপুরেই হাজির হলাম মহেন্দ্রের প্রাসাদপ্রতিম বাড়ির সামনে। ব্যাফেল ওয়ালের গা ঘেঁষে বেঞ্চি পেতে চা-রসের দোকান খুলেছিল এক উড়িয়ানন্দন। একটি ভাঁড়ের অর্ডার দিয়ে চোখের সামনে কাগজ মেলে বসে পড়লাম আমি।

কিছুক্ষণ পরেই গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল কালো গাড়িটা। মহেন্দ্র নেই। এবার আসবে কস্তুরী।

কিন্তু সে যে আজকে আসবেই, তা আমি জানছি কী করে? উত্তরে, মন বলে উঠল, হ্যাঁ, সে আসবে। আসবে শুধু আমার জন্যেই। সূর্যের আলোয় নীলার মতো জ্বলন্ত এই ঘাসপাতা মাড়িয়ে আসবে সে আমারই সামনে।

তারপরেই, আচমকা দেখলাম তাকে। মার্বেলের সিঁড়ির ওপর মার্বেল সুন্দরীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে সে। মরকতমণির মতো উজ্জ্বল একটা শাড়ি একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘিরে রয়েছে দেহবল্লরীকে।

ইচ্ছে হল, তুলির কয়েক টানে ধরে রাখি সেই অপরূপ মূর্তি। কিন্তু হায়রে, সেখানেও আমি অক্ষম। প্রথম যৌবনে নিছক খেয়ালের বশে এঁকেছিলাম কয়েকটি ছবি। বন্ধুরা তা দেখে যা মন্তব্য করেছিল, তা জীবনে ভুলবার নয়।

ছোট ছোট পা ফেলে নেমে এল কস্তুরী। খুট করে দরজা খুলে উঠে পড়ল স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

অদূরে দাঁড় করানো আমার মরিস মাইনরে উঠে বসলাম আমি। শুরু হল পিছু নেওয়া।

কালো গাড়ির যেন কোনও তাড়াই নেই। ধীরে সুস্থে এসে পৌঁছল ময়দানের পাশে, সেখান থেকে মিউজিয়ামের সামনে।

নেমে দাঁড়াল কস্তুরী। দরজা বন্ধ করে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল প্রবেশ পথের দিকে। যেন দ্বিধায় পড়েছে সে, যাব কি যাব না। একবার এক-পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল। বেশ কিছু দূরে গাড়ি থামিয়ে সকৌতুকে দেখতে লাগলাম মরকতমূর্তির দোনামোনা মনোভাব। তারপর মনস্থির করে ফেলল কস্তুরী। আবার স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে স্টার্ট দিল গাড়িতে। নিশ্চয় মিউজিয়াম দেখার চাইতেও মূল্যবান কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে পড়েছে।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আগের চাইতে দ্রুত ড্রাইভ করছে কস্তুরী। হঠাৎ যেন কীসের আকর্ষণে বেগবান হয়ে উঠেছে ওর মন, তাই আর তর সইছে না। সমান গতিতে পেছনে ছুটে চলল মরিস মাইনর।

নগরীর সীমা ছাড়িয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল সামনের কালো গাড়িখানা।

মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ড দেখেই জায়গাটার নাম জানলাম— ঘোষপাড়া।

মহেন্দ্রের মুখে শোনা কাহিনিটা মনে পড়ে গেল। শুধু কাহিনি না বলে কিংবদন্তিই বলা উচিত। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের লীলাভূমি এই ঘোষপাড়া। যেখানকার হিমসাগর দিঘির মাটি ছুঁইয়ে 'সতীমা'-কে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তিনি, সেই পুণ্যভূমিতেই প্রবেশ করেছে কস্তুরীর প্রকাণ্ড কালো গাড়ি।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল কস্তুরী। মরকত রঙের শাড়িখানা হাওয়ায় উড়ছিল অল্প অল্প। কাঁধের ওপর বিচিত্র কায়দায় হেলানো কবরী থেকে কয়েকটি চুল খুলে এসে উড়ছিল মুখের দু-পাশে। অনন্যমনা হয়ে হাঁটছিল ও। সহজ গতিতে ওর পথ চলার ধরন দেখে মনে হল যেন রাস্তায় প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি খোয়া আর গর্তের সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ ঝিকমিক করে উঠল জলের ওপর সূর্যের রোশনাই। এক নক্ষত্র শত নক্ষত্র হয়ে জ্বলছে হিমসাগরের জলের আয়নায়। কস্তুরী কিন্তু দিঘির পাড়ে গেল না। এগিয়ে এল ঝোপঝাড় থেকে বিচ্ছিন্ন একটা কুঞ্জের দিকে।

এককালে যা কুঞ্জ ছিল, আজ তা অযত্নে ঝোপেরই সামিল হয়ে উঠেছে। ফুলবনের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে আগাছার জঙ্গল। এরই মধ্যে একটা ক্ষীণ পায়ে চলা পথ ধরে

অদৃশ্য হয়ে গেল কস্তুরী।

কখনও গাছের আড়ালে, কখনও ঝোপের আড়ালে থেকে একবারও চোখের আড়াল করিনি সামনের মূর্তিকে। দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল কৌতূহল। শহরের মেয়ে শহর থেকে এত দূরে এসে এমন সহজ ভঙ্গিতে ঝোপের মধ্যে যখন অন্তর্হিত হয়েছে, তখন আমার অনুমানই ঠিক। প্রিয় মিলনেই এতদূর ছুটে এসেছে কস্তুরী।

এ অবস্থায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত। কিন্তু না, দেখে যেতে হবে, নিজের চোখে দেখে যেতে হবে মাকড়শার মতো কোন রহস্যের জাল বুনে চলেছে বন্ধুবরের রূপসী ভার্যা।

সন্তর্পণে উঁকি দিলাম। ওই তো বসে রয়েছে কস্তুরী। একা, আর তো কেউ নেই কুঞ্জের মধ্যে। চারধারে বৃত্তাকারের ফুলঝোপের ঠিক কেন্দ্রে একটা জীর্ণ সমাধি। চুনবালির পলস্তারা খসে গিয়ে অনেক জায়গায় বেরিয়ে পড়ছে পাতলা পাতলা সেকেলে বাংলা ইটের গাঁথনি। মানুষ-প্রমাণ উঁচু এই প্রাচীন সমাধির ভেতরে একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে তেল-সিঁদুরে লেখা—

উমা দেবী

ঘাসের ওপর হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু করে স্থির হয়ে বসেছিল কস্তুরী। দৃষ্টি ঘাসের ওপর। নিষ্পাপ সেই দেহের মধ্যে প্রাণ আছে বলে মনে হয় না।

অনেক... অনেকক্ষণ এইভাবে বসে রইল কস্তুরী। তারপর একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ তুলে তাকালে সামনের সমাধির পানে। হাতের মুঠি খুলে ঝোপ থেকে তুলে আনা কয়েকটি ফুল সমাধির প্রান্তে রেখে উঠে দাঁড়াল।

সরে এলাম আমি। অভিভূতের মতো পালিয়ে এসে গা-ঢাকা দিলাম একটা জামগাছের আড়ালে। মহেন্দ্রের মুখে শোনা রোমাঞ্চকর কাহিনির পটভূমিকায় দেখা এই দৃশ্য যেন সাময়িকভাবে আমার চিন্তাশক্তিকেও অবশ করে তুলেছিল। অদ্ভুত ওর বসে থাকার ভঙ্গিমা। এ যেন প্রিয়জনের সমাধির সামনে বসে থাকা নয়, দীর্ঘদিন দূরে থাকার পর স্বগৃহে ফিরে এসে আত্মবিভোর হয়ে যাওয়া। সত্যই আশ্চর্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে কস্তুরীর সৃষ্টিছাড়া ধরনধারণের মধ্যে।

ওই তো বেরিয়ে আসছে কস্তুরী। হাতে একটা ফুল... রক্তগোলাপ... পাতাসমেত ফুলটাকে গালের কাছে ধরে মাটির দিক চোখ নামিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে হিমসাগর দিঘির দিকে। অল্প অল্প হাওয়ায় চূর্ণকুন্তল এলিয়ে পড়ছে কাশ্মীরি আপেলের মতো কপালে। যন্ত্রমানুষের মতোই দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়াল কস্তুরী। কিছুক্ষণ আপন-মনে অত্যন্ত মন্থর চরণে পায়চারি করল... পাড়-বরাবর এদিক থেকে ওদিকে— আবার ওদিক থেকে এদিকে। তারপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জলের দিকে তাকিয়ে। ঘড়ি দেখলাম— পাঁচ মিনিট। সমাধির সামনেও এমনিভাবে পুরো বারো মিনিট বসে ছিল সে। হঠাৎ একটু ঝুঁকে পড়ল কস্তুরী। ক্লান্তি, না কারও প্রতীক্ষায় থাকার অসহিষ্ণুতা?... রক্তগোলাপটাকে চোখের সামনে ধরল... আবার তাকাল জলের পানে... লক্ষ সূর্য জ্বলছে দিঘির জলে... ঠিকরে পড়া আলো ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলছে কস্তুরীর হাতির দাঁতের মতো ধবধবে সাদা মুখের ওপর... আঁটসাট পরিধেয়র মধ্যে দিয়ে উদ্ধত হয়ে উঠেছে ওর যৌবনশ্রী... রামধনুর মতো ঝলমল করছে মরকত শাড়ি... রক্তগোলাপের একটি একটি পাপড়ি ছিঁড়ে দিঘির জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে কস্তুরী। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুলে দুলে ওঠা পাপড়িগুলোর দিকে। ভালো করে দেখার জন্যে এগিয়ে গেলাম... হাত দশেক দূরেই উড়ছে কস্তুরীর শাড়ির অঞ্চল। কিন্তু আশ্চর্য, তবুও তন্ময়তা ভাঙল না ভাববিহ্বল সেই নারী-মূর্তির। এবার পাতাগুলিও উড়ে গিয়ে পড়ল হিমসাগরের জলে... খুব কাছে দাঁড়িয়েছিলাম... তাই স্পষ্ট দেখতে পেলাম সুচারু অধরের প্রান্তে কুয়াশা-ঢাকা পঞ্চমীর চাঁদের মতো ম্লান হাসিটুকু।

পিছিয়ে এলাম আমি। ফিরে আসছে কস্তুরী। একই রকম অলস চলনভঙ্গী। তাড়াহুড়োর লেশমাত্র নেই। আশ্চর্য এই ভাবের ধ্যান। এ-ধ্যানের রহস্য আমাকে জানতে হবেই।

শ্যামবাজারের মোড়ে একটা রেস্তরাঁ থেকে ফোন করলাম মহেন্দ্রকে।

'হ্যালো! মহেন্দ্র? দুর্লভ কথা বলছি— মিনিট খানেক সময় ব্যয় করবে আমার জন্যে?— না, না, আমিই যাচ্ছি তোমার অফিসে... কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই... ঠিক আছে, এই এলাম বলে।'

অফিস দেখে তাক লেগে গেল। একটা পেল্লায় বাড়ির পুরো একতলায় উগ্র সাহেবী কায়দায় সাজানো অফিস। আয়নার মতো ঝকঝকে ফ্লাশ-ডোরের ওদিকে ততোধিক

চকচকে একটি প্রাণোচ্ছল তরুণ বসেছিল। মহেন্দ্রর খোঁজ করতেই বলে উঠল, ‘আপনাকে তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে— উনি এখন কনফারেন্সে।’

সুসজ্জিত ওয়েটিংরুমে পালকের মতো নরম কুশনে গা এলিয়ে দিলাম। একটু পরে কাচের ভেতর দিয়ে দেখলাম, হোমরা-চোমরা কয়েকজন পুরুষকে নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল মহেন্দ্র।

ফিরে এল একটু পরেই। রিসেপসনিস্ট-এর সামনে উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, ‘এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। বড় ব্যস্ত ছিলাম আজ। এসো, আমার কামরায়।’

নিখুঁতভাবে মার্কিনি কায়দায় সাজানো মহেন্দ্রর ঘর। ফাইলিং, ক্যাবিনেট, ইস্পাতের নলচে-চেয়ার, ক্রোমিয়াম পেডেস্ট্যালের ওপর ছাইদানি আর ঘরের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের ম্যাপ। পাশে বোর্ডের ওপর ব্যবসা বৃদ্ধির গ্রাফ।

‘দেখা হল কস্তুরীর সঙ্গে?’

‘পিছু নিয়েছিলাম।’

‘কী কী দেখলে?’

‘সমাধির সামনে গিয়ে বসেছিল।’

‘ঘোষপাড়া? যাঁর কথা তোমায় বলেছি, তাঁরই সমাধিতে...’

‘হ্যাঁ।’

‘দেখলে তো!... বলেছিলাম না তোমাকে?’

অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিলের একপ্রান্তে দুগ্ধধবল টেলিফোনের ঠিক প্রান্তেই রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো কস্তুরীর ছবিটার পানে তাকিয়ে ছিলাম আমি। ছবির ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই শুধোলাম, ‘সমাধির ওপর শুধু একটা নামই দেখলাম। পূর্বপুরুষরা—’

‘তাঁদের সমাধি ওই অঞ্চলেই আছে, তবে অন্যত্র। কী রকম মনে হল তোমার? ভাবগতিক দেখে অলৌকিক সন্দেহ হচ্ছে নাকি? তা ছাড়া ও জায়গায় যে ওর এই প্রথম যাওয়া নয়, তা নিশ্চয় বুঝেছ?’

‘রকমসকম দেখে তো তাই মনে হল। কাউকে পথঘাটের হদিশ জিজ্ঞেস না করেই যেতে দেখলাম। অন্যমনস্ক ছিল আগাগোড়া, তবুও কোথায় যেতে হবে সে-সম্বন্ধে জ্ঞানটা টনটনে ছিল বলেই মনে হল আমার।’

‘ঠিকই মনে হয়েছে তোমার। ওকে উমা দেবীতে পেয়েছে।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারি করে নিল মহেন্দ্র। চর্বির দলা ঠেলে উঠল কড়া ইস্ত্রি-করা কলারের ওপর। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই বিরক্ত হয়ে এক ঝটকায় রিসিভারটা তুলে নিয়ে হাত দিয়ে মাউথপিসটা চাপা দিয়ে বললে, ‘কস্তুরীর ধারণা ও নাকি উমা দেবী। কাজেই কেন আমার এত উদ্বেগ, তা নিশ্চয় বুঝতে পারবে এবার।’

চাপা-গলা শোনা গেল ইয়ার ফোনে। চট করে মাউথপিসটা মুখের কাছে তুলে বললে মহেন্দ্র, ‘হ্যালো... স্পিকিং...’

একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে রইলাম কস্তুরীর ছবির পানে। পাথরের মূর্তির মতো মুখ, চোখের তারায় জীবনের রং আছে কি নেই, তা বোঝা ভার। দমাস করে রিসিভার রেখে দিল মহেন্দ্র। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার— না এলেই ভালো হত। মনে হল, কস্তুরীর রহস্য শুধু কস্তুরীকে ঘিরে থাকলেই ভালো ছিল। মহেন্দ্র যেন আরও জলটা ঘুলিয়ে দিতে চাইছে। অদ্ভুত একটা আইডিয়া মাথায় আসে। ধরা যাক, উমা দেবীর আত্মা —

রাগত সুরে বলে মহেন্দ্র, ‘মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের মতো মরছি, তার ওপর যত্ত ঝামেলা—’

‘বিয়ের আগে তোমার স্ত্রীর পদবী কী ছিল?’

‘সেন। কস্তুরী সেন। শ্বশুরমশাই কোটিপতি— এই সেদিন মারা গেলেন। অনেকগুলো পেপার মিলের মালিক ছিলেন। আদি ব্যবসা পত্তন করেছিলেন ওর ঠাকুরদা। উনি ঘোষপাড়া থেকেই এসেছিলেন বোম্বাইতে ভাগ্যান্বেষণে।’

‘কিন্তু তোমার স্ত্রী হোটেলে থাকতেন?’

টেবিলের ওপর ব্লটার দিয়ে টরেটক্কা করতে করতে মহেন্দ্র বলল, ‘শখ হয়েছিল বলে... আমার শাশুড়ি কিন্তু একদিন চিতপুরে পাথুরিয়াঘাটার কাছে একটা পুরোনো বাড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন, উমা দেবী নাকি এককালে এখানে থাকতেন... একতলায় একটা কিউরিও শপ আছে... যাকগে সে কথা, কস্তুরীকে আজ দেখে তোমার কী মনে হল বলো।’

হাত উলটে দুর্লভ বলল, ‘বলার মতো কিছু নেই।’

‘কিন্তু ওর ধরনধারণ যে স্বাভাবিক নয়, তা তো মানো?’

‘মনে হয়... আচ্ছা, ছবি আঁকা কি উনি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন?’

‘একদম। স্টুডিয়োর যা ছিরি হয়েছে, পা ফেলা যায় না।’

‘কেন?’

‘কী কেন?’

‘ছবি আঁকা ছাড়লেন কেন?’

‘কী করে তা বলি?... অবশ্য ওর মাথা আছে, ছবি আঁকা ছাড়াও আরও অনেক গুণ ভগবান ওকে দিয়েছেন... তা ছাড়া বিয়ের পর মেয়েদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে তো —’

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ‘আর নয়, অনেকটা সময় নষ্ট করলে আমার জন্যে।’

‘না, না, সে কী কথা, অমনভাবে কথা বোলো না। কস্তুরীর এই অবস্থা, আর আমার সময়... আচ্ছা, অনেস্টলি বলো তো, কস্তুরীকে উন্মাদ বলে মনে হয় কি?’

‘মোটেই তা নয়। খুব পড়াশুনার বাই আছে কি ওঁর?’

‘না। তুমি যেরকম বলছ, সেরকম নয়। মাঝে মাঝে সময় কাটানোর জন্যে দু-চারটে হালকা পপুলার ম্যাগাজিন পড়ুয়া সব ঘরেই পাওয়া যায়।’

‘বিশেষ কোনও হবি?’

‘তেমন কিছু মনে পড়ছে না।’

‘ঠিক আছে। দেখি কী করতে পারি।’

‘মনে হচ্ছে, তোমার উৎসাহ কমে এসেছে?’

‘কেন জানি না, বারবার মনে হচ্ছে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছি আমি।’

আসল কথাটা চেপে গেলাম। মনে মনে যে হপ্তার পর হপ্তা কস্তুরীকে ধাওয়া করার সংকল্প গ্রহণ করেছি, তা আর মহেন্দ্রকে জানানো দরকার মনে করলাম না। এ রহস্যের কিনারা করা না পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি, কিন্তু সেকথা বলে লাভ কী?

মহেন্দ্র বলল, ‘এ ঝামেলায় তোমাকে টেনে আনার জন্যে আমি কুণ্ঠিত। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, আমার অবস্থাটা। যাক, নতুন খবরটবর পেলে টেলিফোন কোরো।’

‘করব।’

রাস্তায় বিকেল ছ-টায় ভিড় শুরু হয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে কেরানিকুল ছুটেছে নিজের নিজের সুইট হোমের দিকে। হোম নেই শুধু আমার... হয়তো একটা আছে... কিন্তু তাকে সুইট বলা চলে না কোনওমতেই... কস্তুরী... কস্তুরী... কস্তুরী... একটা শরবতের দোকানে

বসে পড়ে লস্যির অর্ডার দিলাম... উমা দেবীর সমাধির সামনে স্বপ্ন দেখছে কস্তুরী... বাড়ির জন্যে, মন কেমন করছে! বাড়ির জন্যে না, ওই সমাধির জন্যে! না, না, এসব কী অবাস্তব কথা ভাবছি আমি। কিন্তু কোনটা অসম্ভব, আর কোনটা সম্ভব, তা-ই বা সঠিক জানছে কে?

ফ্ল্যাটে ফিরলাম অনেক রাতে। রগের দু-পাশে টিপটিপ করছে। খাওয়ার পাট হোটেলেই চুকিয়ে এসেছিলাম। তাই জুতোসুদ্ধই কিছুক্ষণ চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়। তারপর উঠে পড়ে জামাকাপড় পালটে অ্যাসপিরিনের বড়ি গিলে নিভিয়ে দিলাম আলোটা।

(৩)

বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ .পরিয়ে গেল কস্তুরী। বেয়নেটধারী ভোজপুরী দারোয়ান বারেক ফিরে তাকাল ওর সুঠাম দেহের দিকে। কস্তুরীর কিন্তু কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। আজ কিন্তু গাড়িতে নয়, হেঁটে। অস্বাভাবিক দ্রুত হাঁটছিল ও। যেন জরুরি এনগেজমেন্ট রক্ষা করার জন্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও চলেছে কোথায়? আজকে একেবারেই অন্যভাবে সেজেছে কস্তুরী। আঁটসাট যৌবনোদ্ধত পোশাকের বদলে সাদাসিধে বাদামি রঙের একটা তাঁতের শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গ। সাপের মতো বেণী এলিয়ে পড়েছে পিঠের ওপর।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কস্তুরী। মাথা নিচু করে কী ভাবলে। তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল সামনে। কোনও দ্বিধা না করে উঠে পড়ল সামনের ট্যাক্সিটায়।

স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পেছনের ট্যাক্সিটায় উঠে বসলাম আমি।

চিতপুরের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সামনের ট্যাক্সিটা। এই বাড়িটার কথাই মহেন্দ্র বলেছিল না? ওই তো একতলায় কিউরিও শপ রয়েছে। কোনওরকম ইতস্তত না করে সিধে ভেতরে ঢুকে গেল কস্তুরী। মহেন্দ্রর বর্ণনার সঙ্গে শুধু একটি জিনিস মিলল না। একতলা বাদে দোতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত সবটাই একটা হোটেল। বড় বড় বাংলা অক্ষরে লেখা:

‘পরিবার বাসা’

বাইরে থেকে দেখে যা মনে হল খানদশেকের বেশি ঘর নেই 'পরিবার বাসা'-য়। অফিসে ঢুকে পড়ি আমি। থান পরনে একজন মোটাসোটা বিধবা মহিলা বসে উল বুনছিল।

ভণিতা না করে বলে উঠি, 'ঘর নিতে আসিনি। এইমাত্র যে ভদ্রমহিলাটি ভেতরে গেলেন, তাঁর নাম কী?'

'কে আপনি?'

পকেট থেকে একটা পুরোনো আইডেন্টিটি কার্ড বার করে এগিয়ে দিলাম। ডিটেকটিভ থাকাকালীন এই কার্ডটি যত কাজে না-লাগুক, এখন তা লাগল। পুরোনো পাইপ, কাগজ, বিলের সঙ্গে কার্ডটিও রেখে দিয়েছিলাম মানিব্যাগে। কোনও দরকারে আসবে না জেনেও কেন জানি এরকম বহু পুরোনো জিনিসকে ফেলে দিতে পারি না। কিন্তু এই নির্বোধ অভ্যাসই আজ অনেক সহজ করে তুললে আমার গোপন তদন্তকে।

চোখ তুলে বললে বিধবা, 'কস্তুরী কৌশিক।'

'নিশ্চয় এই প্রথমবার দেখছেন না ওঁকে?'

'প্রায়ই আসেন উনি।'

'কারও সঙ্গে দেখা করতে আসেন কি?'

'উনি ভদ্রঘরের মেয়ে।'

'বন্ধু-বান্ধব, অথবা অন্য কেউই কি ওঁর সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসেন না?'

'না। আজ পর্যন্ত আপনি ছাড়া আর কেউ আসেনি।'

'তাহলে এখানে উনি করেন কী?'

'জানি না; ও কাজ আমার নয়।'

'ওঁর ঘরের নাম্বার কত?'

'উনিশ। তিনতলা।'

'এ হোটেলের সব চাইতে ভালো ঘর নিশ্চয়?'

'না; তবে ভালো ভালো ফার্নিচার আছে। বারো নম্বর ঘর দিতে চেয়েছিলাম, উনি নেননি। ওই ঘরটিই উনি চান।'

'কেন?'

'তা বলেননি। খুব সম্ভব ঘরটার বেশি রোদ্দুর পড়ে— তাই।'

'পার্মানেন্টলি নিয়েছেন নিশ্চয়?'

'একমাসের জন্য নিয়েছেন।'

'কবে এসেছেন?'

উলের কাঁটা টেবিলের ওপর রেখে রেজিস্টারের পাতা ওলটালে বিধবা মহিলা।

'হপ্তা তিনেক হল বলেই তো মনে হয়। হ্যাঁ, এই তো ৬ এপ্রিল।'

কতক্ষণ থাকেন ঘরের মধ্যে? অনেকক্ষণ নিশ্চয়?'

'কখনও ঘণ্টাখাটেক, কখনও ঘণ্টাদুয়েক।'

'সঙ্গে মালপত্র আছে তো?'

'না, কোনও লাগেজ নেই।'

'নিশ্চয়ই প্রতিদিন আসেন না, তা-ই না?'

'না, হপ্তায় দু-দিন কি তিনদিন।'

'ভদ্রমহিলার হাবভাব একটু অদ্ভুত নয় কি? এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন এর আগে?'

কপালের ওপর সুতো বাঁধা চশমাটা ঠেলে তুলে দিয়ে প্রৌঢ়া চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'পাঁচরকম লোক এখানে আসছে তো, ওরকম খাপছাড়া স্বভাব সবারই একটু-আধটু থাকে। হোটেলে কাজ করলে এরকম প্রশ্ন করতেই পারতেন না।'

'আপনাদের টেলিফোন আছে দেখছি। উনি ফোন করেন কাউকে?'

'না।'

'ফোন আসে না?'

'না।'

'কত বছর হল হোটেল বানানো হয়েছে এ-বাড়িতে, তা জানেন কি?'

'জানি। বছর পঞ্চাশ হল।'

'তার আগে?'

'গেরস্থবাড়ি ছিল। অন্তত আমার তো তা-ই মনে হয়।'

'উমা দেবী বলে কারও নাম শুনেছেন কি?'

'না। রেজিস্টার দেখব কি?'

'দরকার নেই।'

ভাবলেশহীন মুখে আবার উলের কাঁটার দিকে চোখ নামাল বিধবা প্রৌঢ়া। আর আমি সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

তিনতলার এই বিশেষ ঘরটিতে কীসের সন্ধান পেয়েছে কস্তুরী? কী আছে ও-ঘরে? উমা দেবীর শোবার ঘর ছিল কি? কোন রহস্যময় আকর্ষণে এত দূরে এই বিশেষ বাড়ির বিশেষ ঘরটিতে এসে উঠেছে কস্তুরী কৌশিক? অনেক কথাই ভিড় করে এল মনে... অতীন্দ্রিয় শক্তি নয় তো?

ফুটপাতের ভিড়ের মধ্যে আপন মনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি। কস্তুরী নেমে এসেছে রাস্তায়। প্রায় আধঘণ্টার মতো হোটেলে ছিল ও। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। চোখে পড়ল একটা ট্যাক্সি। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল ভেতরে।

চিতপুরের মতো রাস্তায় চাইলেই তো আর ট্যাক্সি পাওয়া না। কিন্তু আমার কপাল ভালো। ঠিক পেছনেই আর একটা খালি ট্যাক্সি। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসলাম ভেতরে।

ভাঙাচোরা লোহালক্কড়ের স্তূপের পাশে দাঁড়াল সামনের ট্যাক্সি। নেমে দাঁড়াল কস্তুরী। অলস মন্থর চরণে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনে। স্তূপীকৃত মরচে-ধরা লোহা, পাইপ আর নোঙরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এমন এলোমেলোভাবে হাঁটতে লাগল যেন গন্তব্যস্থান কী, তা-ই সে জানে না। যেন নিছক বেড়ানোই উদ্দেশ্য— আর কিছু নয়। চিতপুরের জনবহুল অঞ্চলের হোটেল 'পরিবার বাসা' আর গঙ্গার ধারের এই জনবিরল অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্রটা যে কোথায়, তা-ই ভেবে পেলাম না। ইচ্ছে হল, কস্তুরীকে পেরিয়ে যাই। কোনও কথা নয়, আলাপ নয়, শুধু হেঁটে যাই পাশাপাশি। কথার দরকার কি, নদীর বুকে ভাসমান বয়াগুলোর ওপর চোখ রেখে পাশাপাশি হাঁটুক দুটি নির্বাক মূর্তি। কিন্তু না, তা সম্ভব নয়। কাজেই এগিয়ে যাওয়ার প্রলোভনকে সামাল দেওয়ার জন্যেই একেবারেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকখানি এগিয়ে গেছে কস্তুরী। মনে হল বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু পিছু নেওয়ার মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে, যা শুরু করলে আর শেষ করা যায় না। তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আরও সামনে।

কোথাও জড়ো করা রয়েছে দড়ির গাদা, কোথাও ভাঙা ইট। কোথাও খোয়া, কোথাও বালি, কোথাও পিপে, আবার কোথাও ভাঙা প্যাকিং কেস। মরচে ধরা রেললাইনও দেখা

যাচ্ছে মাঝে মাঝে... ওদিকে মাথা উঁচু করে রয়েছে একটা ক্রেন... গঙ্গার ওপারে জুটমিলের চিমনি দেখা যাচ্ছে... বিষন্ন এই শহরতলীতে কীসের আকর্ষণে ছুটে এল কস্তুরী? আমরা দু-জন ছাড়া আর কেউ নেই এদিকে। কিছুই খেয়াল নেই কস্তুরীর— আপন মনে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। আমাকে লক্ষ করা তো দূরের কথা, আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকারও কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ওর চলাফেরায়।

একটু একটু করে একটা অস্পষ্ট ভয় ঘিরে ধরে আমাকে। নদীর ধারে হাওয়া খেতে আসেনি কস্তুরী। বিকৃত মস্তিষ্করা যেভাবে সব কিছুর সান্নিধ্য ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে চায় অনেক দূরে— এ কি তবে তা-ই? না, নিছক স্মৃতিহীনতার ঘোর? আবার জোরে জোরে পা চালাই আমি।

একটা নিরালা গুদোমের দিকে এগিয়ে চলেছে কস্তুরী। ইটের গাঁথনির ওপরে টিনের শেড... সামনে একটা ছোট ঘর, সম্ভবত দারোয়ানের আস্তানা। বড় বড় কতকগুলো প্যাকিং-কেস পড়েছিল সামনে। একটার ওপর বসে পড়ল কস্তুরী।

একটু দূরে কয়েকটা বড় পিপের আড়ালে থেকে সজাগ দৃষ্টি মেলে রইলাম আমি। কী জানি কেন, এক মুহূর্তের জন্যেও ওই অদ্ভুত মেয়েটি ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনার সাহস হল না আমার।

হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করল কস্তুরী। হাতের উলটো পিঠ বুলিয়ে দেখে নিলে প্যাকিং-কেসের ওপরটা ভিজে কি শুকনো। তারপর ফাউন্টেন পেন বার করে ঝুঁকে পড়ল কাগজের ওপর। সামান্য আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুঠাম দেহবল্লবী।

ভাবলাম, এই হল প্রিয়তমের জন্য শবরীর প্রতীক্ষা।

নিছক অনুমান। কতটুকুই বা তার মূল্য। দয়িতকে চিঠি লেখার দরকার হলে এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে এতদূরে আসার কোনও প্রয়োজন আছে কি? এমন গোপনীয় চিঠি তো বাড়ির মধ্যেই পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে লেখা যেত— গঙ্গার এই বিজন তীরে আসার দরকারটা কী?

সমানে লিখে চলেছে কস্তুরী। মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে ঝরনা-কলম। সমস্ত চিঠিটাই যেন মনে মনে আগে থেকেই সাজিয়ে নিয়েছে ও; চিতপুরের হোটেলে আধঘণ্টা কেটেছে হয়তো এই চিঠির বিষয় ভাবতেই।

আবার অনুমান! কী মুশকিল, অনুমান ছাড়া তো আঁকড়ে ধরার মতোও কিছু নেই। আচ্ছা, মহেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদের সূচনা নয় তো? বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়?...

তাহলে অবশ্য ওর এই অস্থির মনের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায় না উমা দেবীর সমাধি দর্শনের কোনও মোটিভ।

দারোয়ানের ছোট্ট ঘর থেকে তখনও কেউ বাইরে এল না। হয়তো কেউ নেই ভেতরে— থাকলেও নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত!

চিঠিটা সন্তর্পণে ভাঁজ করল কস্তুরী; ধীরেসুস্থে খামের মধ্যে ভরে ফেলল। এবার কী করবে ও? যে-পথে এসেছে, সেই পথেই ফিরবে নিশ্চয়। খামের ওপর ঠিকানা লেখা হয়ে গেল ওর। জিভ বুলিয়ে মুখটা সেঁটে দিল ভালো করে। তারপর আশপাশে তাকিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামান্য দ্বিধা ফুটে উঠল ভাবে ভঙ্গিমায়।

দুর্নিবার হয়ে উঠল আমার কৌতূহল, খামের ওপর লেখা ওই নাম-ঠিকানায় একবারটি চোখ বোলাতে চাই— বিনিময়ে সর্বস্ব দিতেও রাজি আছি আমি।

তখনও দ্বিধা কাটেনি কস্তুরীর। ফিরবে কি ফিরবে না, এমনি দোনামোনা ভাব নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ভাঙাচোরা পাটাতনের পাশে। অদূরেই পিপের গাদার আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। এত কাছে এসে দাঁড়াল কস্তুরী যে, একটা অদ্ভুত সুবাস ঝোড়ো ঝাপটার মতোই এসে লাগল নাকে। অল্প অল্প বাতাস বইছে গঙ্গার দিক থেকে। শাড়িটা মৃদু শব্দ করে উড়ছে পেছনে। খুব, খুব শান্ত ওর মুখচ্ছবি, অন্তত পাশের দিকে থেকে যতটুকু দেখা যায়। কোনও তরঙ্গ নেই সেই মুখে, যদিও বা থাকে কিছু, তবে তা হতাশার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। চোখ নামাল কস্তুরী, উলটে দেখল খামটা, তারপর আচমকা দু-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। চার টুকরো। আরও কুচি। আরও। আরও। শেষে ছোট ছোট কাগজের টুকরোগুলো উড়িয়ে দিলে বাতাসে। কিছু নদীর জলে পড়ল, কিছু ভাসতে ভাসতে এসে পড়ল ঘাসের ওপর। পাথরের মতো মুখে জলের ওপর ভাসমান কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ও। শূন্যগর্ভ দৃষ্টি। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা একবার রগড়ালে ডান হাতের চেটোয়— যেন কোনও অপ্রিয় অদৃশ্য বস্তুকে মুছে ফেলতে চাইছে তালু থেকে। জুতোর ডগা দিয়ে ঘাসের ওপর থেকে কয়েকটা কাগজের কুচিকে খুঁটে ঠেলে দিলে জলের দিকে। তারপর প্রশান্ত মুখে পা বাড়ালে সামনে।

ঘাসের ওপরেও ছলকে উঠল খানিকটা জল।

'কস্তুরী!'

এক মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া বাকি সবই জলে পড়েছে। ছন্নছাড়া মতো উড়ে বেড়াচ্ছে এই কয়েকটা কুচো।

'কস্তুরী!'

বুশশার্টটা একটানে খুলে ফেলে ছুটে এলাম কিনারায়। বলয়াকারে ছড়িয়ে পড়ছে নদীর জল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলাম জলে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ক্ষিপ্তের মতো হাতড়াতে লাগলাম সামনে। দেহের অণুপরমাণু থেকে কেবলমাত্র একটি নামই ক্রমাগত ঠেলে উঠে আসতে লাগল ঠোটের ডগায়: 'কস্তুরী! কস্তুরী!'

কিনারার কাছে নোংরা ঘোলাটে জলে খুব জোর সেকেন্ড দুয়েক রইলাম। পরক্ষণেই ভেসে উঠলাম ওপরে। স্রোতের টানে বেশ কয়েক গজ ভেসে গেছে কস্তুরী। চিত হয়ে ভাসছে ও, ডুবে যাওয়া মানুষের মতোই শিথিল সর্বাঙ্গ। কাছাকাছি পৌঁছতে না-পৌঁছতেই দেখি, একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে কস্তুরী। ঠিক যেন একতাল নরম ঠান্ডা মাংসের দলা — প্রাণের চিহ্ন নেই বললেই চলে। হাঁপাচ্ছিলাম আমি। কমজোরি হাপরের মতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ফুসফুস জোড়া। হাত-পাগুলো ভারী হয়ে উঠেছিল লোহার মতো। হাত বাড়িয়ে কস্তুরীর ঘাড়ের কাছটা আঁকড়ে ধরলাম। যেভাবেই হোক, মাথাকে তুলে রাখতে হবে জলের ওপর। অপর হাতে জল টেনে এগিয়ে চললাম তীরের দিকে। শক্তি খরচের অনুপাতে কাজ হল খুব অল্প। তীর অনেক দূরে। কী অসম্ভব ভারী কস্তুরী! এর মধ্যেই যেন গঙ্গার মাটির মধ্যে গেঁথে যেতে শুরু করেছে তনুলতা! বয়াগুলো বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে, স্রোতের টানে হু-হু করে ভেসে চলেছি দু-জনে। আর বেশি দূর নেই। কিন্তু আর তো পারছি না আমি। ফুসফুসে আর জোর নেই। শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্যে কোনওদিন মাথা ঘামাইনি। হাঁ করে বুকভরা বাতাস নিতে গিয়ে বেশ খানিকটা গঙ্গাজল গিলে ফেলি এবার।

কয়েকটা ধাপ... একটা ঘাট দেখা যাচ্ছে। পাশেই একটা নৌকো বাঁধা। ওই দড়িটা... ওই দড়িটা যেভাবেই হোক ধরতে হবে আমাকে। ধাপ ক-টায় একবার উঠে দাঁড়াতে পারলে... এসে গেছে... অনেকটা কাছে এসে গেছে... হাত বাড়িয়ে কোনওমতে দড়িটা ধরে ফেললাম... টেনে আনলাম নিজেকে... পাওয়া গেছে পায়ের তলায় সিঁড়ির ধাপ।

এবার কস্তুরীকে তোলার পালা। এক-একটা ধাপ টেনে তুলে বেদম হয়ে হাঁপাতে থাকি কিছুক্ষণ। বৃষ্টির মতো জল ঝরে পড়ছে দু-জনের দেহ থেকে। জল থেকে ঠিক ওপরের

ধাপটায় সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে এনে শুইয়ে দিলাম। এক মিনিট। জল একটু ঝরে গেলেই নিশ্চয় অনেকটা হালকা হয়ে যাবে কস্তুরী। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার নিচু হলাম আমি। খানিকটা তুলে ধরে, খানিকটা হিঁচড়ে টেনে পৌঁছলাম সিঁড়ির একদম ওপরের ধাপে। পরের মুহূর্তেই ভেঙে পড়লাম নিজে। শরীরের শেষ শক্তি-বিন্দুটুকুও গেছে ফুরিয়ে। কস্তুরীই সবার আগে নড়ে উঠল। কী করুণ সেই ছবি! গালের ওপর লেপটে রয়েছে কালো কুন্তল। গালের রক্তাভা জলের মধ্যেই মিলিয়ে গেছে। চোখের পাতা খোলা, বেদনাঘন দৃষ্টিজাল আকাশের পানে মেলে ধরে কী যেন চেনবার চেষ্টা করছে সে।

'এখনও মরেননি আপনি।' ছোট্ট করে বললাম আমি।

চোখের মণিদুটো আস্তে আস্তে ঘুরে গিয়ে স্থির হয়ে রইল আমার পানে— যেন অন্য এক জগৎ থেকে এই পৃথিবীর মানুষের পানে অবাক চাহনি মেলে ধরেছে কস্তুরী কৌশিক। বলল ফিসফিস সুরে, 'মরতে আমার ভালো লাগে।'

'খুব হয়েছে, এবার দয়া করে উঠে বসুন।'

কিন্তু তখনও উঠে বসার মতো অবস্থায় আসতে পারেনি কস্তুরী। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসার বিহ্বলতা তখনও পুরোপুরি কাটেনি, তাই আমিই ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। দারোয়ানের ছোট্ট ঘরটা ঘাট থেকেই দেখা যাচ্ছিল; বেশি দূরে নয়। গুরুভার নিয়ে অবসন্ন পা-দুটোকে টানতে টানতে যেন একযুগ পরে এসে দাঁড়ালাম ঘরটার সামনে।

'কৌন হ্যায়?'

কোনও সাড়া নেই। চৌকাঠের ওপর পা রাখতেই ছেঁড়া চটের পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন হিন্দুস্থানী বউ; কোলে নবজাত শিশু। খুব সম্ভব রসুই নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

ভিজে কাকের মতো চেহারা দেখেই চমকে উঠল বউটি, 'কেয়া হুয়া বাবুজী?'

'বিপদ, ভারী বিপদ। ইনি জলে ডুবে গিয়েছিলেন; শুকনো কাপড়-চোপড় আছে?'

'জরুর। আইয়ে, অন্দরমে আইয়ে।' কোলের শিশু কেঁদে উঠল। বউটি তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে খাটিয়ায় পাতা মলিন চাদরটা এক হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'বৈঠিয়ে, হিঁয়া বৈঠিয়ে।'

আমি আর বসলাম না। আলতো করে কস্তুরীকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পিপেগুলোর আড়ালে বুশশার্টটা ফেলে এসেছি, টাকাকড়িও রয়েছে শার্টের পকেটেই।

যথাস্থানেই পড়েছিল শার্টটা। মানিব্যাগও খোয়া যায়নি।

এইমাত্র যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল, তার কোনও চিহ্ন ছিল না গঙ্গার ঘোলাজলে। অথচ কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না সেই দৃশ্য— কিনারা পেরিয়ে শূন্যে একটা পা এগিয়ে দিয়েছে কস্তুরী, শান্ত, সুন্দর মুখচ্ছবি... উদ্বেগের বিন্দুমাত্র ছায়া নেই সে-মুখে... জলে পড়েও ধীর স্থির তার দেহ। হাত-পা ছোড়া নেই, মৃত্যুর সিংহদরজা দেখেও শিউরে উঠে হাঁকপাঁক করা নেই— অচঞ্চল মুখে জলের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার সেই ভয়াবহ দৃশ্য কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না আমি। মৃত্যুর কোলে এমনি করে কি কেউ নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিতে পারে? না, না, এ মেয়েকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলে না, কখনওই না। ছুটতে ছুটতে ফিরে আসি আমি। বর্তন থেকে দুটো গেলাসে গরম দুধ ঢালছিল হিন্দুস্থানী বউটি।

'কোথায় গেলেন উনি?'

ইঙ্গিতে পর্দার ওদিকে দেখিয়ে দিল মেয়েটি। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কস্তুরী। পরনে একটা সস্তার ফুলকাটা ছাপা শাড়ি। ভিজে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে সারা পিঠে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম। বিধাতা যাকে রূপ দেন, তাকে এমনি অকৃপণ হাতেই সাজিয়ে দেন। বসনে দরিদ্র হয়েও তাই অপরূপ মনে হল কস্তুরীকে।

একটা ধুতি আর কামিজ এগিয়ে ধরেছিল বউটি। বেঢপ হলেই বা আর উপায় কী। গজগজ করতে করতে তা-ই নিয়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে জামাকাপড় পালটে নিলাম। কামিজটা পরলাম না। বুশশার্টটা গায়ে দিলাম শুকনো ধুতির ওপর। দারুণ রাগ হয়ে গেল মহেন্দ্রের ওপর। দুটো দশ টাকার নোট বউটির হাতে গুঁজে দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

দরজার ঠিক বাইরে বিচিত্র বেশে দাঁড়িয়েছিল কস্তুরী। কোলে দিগম্বর শিশুটি। 'চলুন, যাওয়া যাক।' রুক্ষ স্বরে বলি আমি।

'চুপ,' ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল কস্তুরী। 'ঘুম ভেঙে যাবে।' বলে, সন্তর্পণে শিশুটিকে তুলে দিলে মায়ের কোলে। ভিজে পোশাকগুলো দলা পাকিয়ে হাতে তুলে দিল বউটি।

যেতে যেতে নিরুত্তাপ স্বরে শুধালাম, 'কোথায় পৌঁছে দেব আপনাকে?'

'প্রথমে আপনার বাড়িতেই যাওয়া যাক। ময়লা ধুতিটা না ছাড়া পর্যন্ত আপনার মেজাজ ঠান্ডা হবে না, তা-ই না?'

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'নিউ আলিপুরে... আমার নাম কস্তুরী কৌশিক... স্বামী মহেন্দ্র কৌশিক... নিমতায় কারখানা আছে।'

'আমি দুর্লভ সামন্ত। পেশায় ব্যবহারজীবী, অর্থাৎ উকিল।'

একটু চুপ। তারপর, 'আপনি আমার ওপর ভীষণ রেগেছেন,' বলল কস্তুরী, 'কিন্তু কী হয়েছে বলুন তো? বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।'

'আত্মহত্যা করতে গেছিলেন আপনি।'

আশা করেছিলাম এবার কিছু বলবে কস্তুরী। কিন্তু নির্বিকার মুখে কোনও ভাব-পরিবর্তন না দেখে আবার বললাম, 'আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন... জানি আপনার অনেক দুঃখ... কোনও শক যদি পেয়ে থাকেন...'

'না,' মৃদু স্বরে বলল কস্তুরী, 'যা ভাবছেন, তা নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষপাড়ার দেখা কস্তুরী ফিরে এল আমার পাশে, হুবহু সেই রহস্যময় ভাবতন্ময়তা ফুটে উঠল কুচকুচে কালো চাহনিতে।

বলল, 'গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কেন, তা জানি না।'

'বটে। তাহলে চিঠিটা কার নামে শুনি?'

লাল হয়ে উঠল কস্তুরী।

'স্বামীকে লিখেছিলাম। কিন্তু যা বোঝাতে চেয়েছিলাম চিঠির মধ্যে, তা এমনই অস্বাভাবিক যে শেষকালে—' বলে, মুখ তুলে হাতের ওপর হাত রেখে শুধোল, 'আবার বেঁচে থাকা কি সম্ভব হবে আমার পক্ষে?... মানে... মৃত্যুর... পর... আর কেউ হয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব?... আপনিও এড়িয়ে যাচ্ছেন, উত্তর দিতে চাইছেন না। ভাবছেন, আমি পাগল।'

'শুনুন—'

'আমি পাগল নই, বিশ্বাস করুন, আমি পাগল নই... কিন্তু আমার অতীত যে অনেক, অনেক দূর ছড়িয়ে আছে, ছেলেবেলার স্মৃতিরও অনেক ওপারে— এই অনুভূতিটাকে আমি

কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না মন থেকে। মনে পড়ে, ছোট্ট থাকার আগেও আমার একটা জীবন আছে। মানে— ছিল, আস্তে আস্তে তার সবকিছুই আমার মনে পড়ছে... কিন্তু এসব কথা আপনাকে বলছি কেন, বুঝছি না।'

'বলুন, বলে যান।'

'যেসব জিনিস কোনওদিন দেখিনি, তাও মনে করতে পারি আমি। মাঝে মাঝে মনে পড়ে অনেক মুখ— কখনও দৃশ্যের পর দৃশ্য। মধ্যে মধ্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি, আমি তরুণী নয়, বুড়ি, অনেক বেশি আমার বয়স।'

আচ্ছন্নের মতো কথা বলে চলেছিল কস্তুরী। গাঢ় হয়ে এসেছিল স্বর। দ্রুত নয়, থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট অথচ ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে চলেছিল সে। আড়ষ্ট হয়ে শুনতে লাগলাম আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কস্তুরী, 'নিশ্চয় কোনও অসুখে ভুগছি আমি। যদি তা-ই হয়, তাহলে যা কিছু আমার মনে পড়ে, সবই অস্পষ্ট, আবছা হওয়াই উচিত ছিল, নয় কি? এত স্পষ্ট হবে কেন মুখগুলো?'

'কিন্তু আজ আপনি ঝোঁকের মাথায় যে কাজটা করলেন, তা কি আগে থেকে মোটেই ভাবেননি?'

'মনে তো হয় ভেবেচিন্তেই করেছি। দিনে দিনে একটা অনুভূতি জোরাল হয়ে উঠছে আমার মধ্যে। আমি এখানে আগন্তুক, আমার প্রকৃত জীবন রয়েছে আমার পেছনে। যদি তা-ই হয়, এই মেকি জীবনকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কী?... সবার কাছেই... জীবন হল মৃত্যুর ঠিক বিপরীত... আর, আমার কাছে...'

'এ ভাবে কথা বলাটা ঠিক নয়। স্বামীর কথা ভাবুন।'

'বেচারা! ও যদি জানতে পারে—'

'না, উনি জানবেন না। আমাদের দু-জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক আপনার জীবনের এই রহস্য।'

শেষের দিকে আপনা হতেই কোমল হয়ে এসেছিল আমার স্বর। চোখ তুলে হাসল কস্তুরী। যেন সোনালি আভা দেখা দিল ছেঁড়া মেঘের আড়ালে।

'ঠিক বলেছেন। এ রহস্য সিক্রেট হয়েই থাকুক আমাদের মধ্যে। আমার কপাল ভালো, এই সময়ে এখানে হাজির ছিলেন আপনি।'

‘তা ছিলাম। এই যে ট্যাক্সি— ট্যাক্সি।’ আচমকা চেঁচিয়ে উঠি আমি। এ অঞ্চলে এ সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া আর ভগবান পাওয়া একই জিনিস।

উঠে বসি দু-জনে। টপ গিয়ারে উড়ে চলে ট্যাক্সি। হাওয়ায় উড়তে থাকে ভিজে চুল। খাদে স্বর নামিয়ে আপন মনেই বলে কস্তুরী, ‘এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম আমি।’

ট্যাক্সি থামে।

দরজা খুলে দিই আমি, ‘আসুন, ঘরে আসুন। আমি ব্যাচেলর, কাজেই ঘরটাও তত ঝকঝকে নয়, তাহলেও এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভালো দেখায় না।’

ভাগ্য ভালো, হলঘরে বা সিঁড়িতে কারও সঙ্গে মুখোমুখি হলাম না। এই রকম পোশাক পরা অবস্থায় সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে ব্যাচেলরকে বাড়ি ফিরতে দেখলেই গুজব ছুটবে হাওয়ার আগে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল টেলিফোনের শব্দ। সোফাসেটে কস্তুরীকে বসিয়ে দৌড়ে গেলাম পাশের ঘরে। ‘হ্যালো!’

মহেন্দ্রর স্বর। ‘এর আগে দু-দু-বার ফোন করেও পাইনি তোমায়। একটা জিনিস হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার, তোমাকে তা বলাই হয়নি... উমা দেবীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা... জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন উনি। জানি না, খবরটা তোমার কোনও কাজে আসবে কি না। তোমার রিপোর্ট কী? খবর আছে?’

‘দেখা হলে বলব। এখন ছাড়ছি। মক্কেল রয়েছে।’

(৪)

.নাট বইয়ের পাতা উলটোলাম। মে ৬। বিরাগ মিশোনো চোখে তাকাই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলোর দিকে। সবসুদ্ধ তিনটে কেস। তার মধ্যে একটা বিবাহবিচ্ছেদ। দু-মুঠো ভাত জোটাতে গিয়ে না জানি আরও কতদিন এইভাবে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করতে হবে আমাকে।

টেবিলে বসে ফাইলটা টেনে নিলাম। ওপরে কোণে ঝরঝরে অক্ষরে ইংরাজিতে টাইপ করা "কৌশিক কেস", শেষ কয়েক দিনের পাতাগুলো অলস ভঙ্গিমায় উলটে চললাম। এপ্রিল ২৭। গঙ্গার ধারে বেড়ানো। ২৮। লাইট হাউস সিনেমা। ২৯। মোটরে জি. টি. রোডে বর্ধমান পর্যন্ত। ৩০। ফিরপোতে চা-পান। অনেকক্ষণ হাসি ঠাট্টা। মে ১। ব্যারাকপুর লাটসাহেবের বাগানে। চমৎকার ড্রাইভ করে কস্তুরী। ২। চন্দননগরে গঙ্গার তীরে। ৩। দেখা হয়নি। ৪। লেকের ধারে রাত আটটা পর্যন্ত। ৫। আবার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে টানা ড্রাইভিং...

আর আজকে মে ৬। আজ দিনের শেষে লিখব কস্তুরীকে আমি ভালোবাসি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আজ থেকে প্রতিটি দিনের গ্রন্থনা শুরু হবে এই তথ্যের ভিত্তিতেই। একটি পরিত্যক্ত অন্তরে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে বিষণ্ন প্রেম। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, কস্তুরীর মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। বন্ধুর মতোই মিশেছে আমার সঙ্গে, বন্ধুর মতো মন খুলে কথা বলতে পারে যার সঙ্গে, এমনি একটি পুরুষের সাহচর্য পেয়েই সে খুশি। এর চাইতে অধিক কিছু তার কল্পনাতেই এখনও আসেনি। সেই কারণে বোধহয় স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কোনও তাগিদ অনুভব করেনি।

আর, সুকৌশলে নিজের অংশ অভিনয় করে চলেছি আমি। আইনবিদের গোয়েন্দাগিরি আর অসামান্যা রূপসী যুবতীর সঙ্গ-সুখ। দিনগুলো কাটছে ভালোই।

ফাইলটা বন্ধ করে সরিয়ে দিয়ে পা টান-টান করে ছড়িয়ে দিলাম টেবিলের তলায়... মাথা এলিয়ে দিলাম চেয়ারের পিঠে... কস্তুরীর ব্যাধি। কস্তুরী সুস্থ; অসুস্থ নয় মোটেই। তবুও কোথাও যেন একটা গলদ থেকে গেছে।

ঠিক বলেছে মহেন্দ্র। আনন্দে-হুল্লোড়ে ওকে মাতিয়ে দিয়ে আলোময় এই জীবনের অংশে ওকে ধরে রাখা কোনওক্রমে বন্ধ হলেই অদ্ভুত এক তন্ময়তায় আবিল হয়ে ওঠে ওর দুই চোখ।

একদিন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিলাম, 'আপনাকে দেখলেই জনার কথা মনে পড়ে যায়।'

ভুরু কুঁচকে শুধিয়েছিল কস্তুরী, 'কে সে মহাপুরুষ?'

'পুরুষ নয়, মহিলা। মাহিষ্মতীরাজ নীলধ্বজেব স্ত্রী।'

'বটে।'

'জনা খুব গঙ্গাভক্ত ছিলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃষ্ণ না থাকলে সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যেত তাঁর তেজে। পুত্রশোকে কাতর হয়ে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।'

'ওঃ।'

'আপনাকে জনা বলেই ডাকব। জনা না বলে ঘৃতাচী বললেই বোধহয় বেশি মানাত, কিন্তু—'

'আপনার পৌরাণিক নামের ধাক্কায় আমার মাথা ঘুরছে।' চুকচুক করে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বলেছিল কস্তুরী, 'জনা নামটা অবশ্য মন্দ নয়। গঙ্গার বুক থেকে আপনিই আমায় ফিরিয়ে এনেছেন, এই তো?'

সেই দিন থেকে জনা নাম ধরেই ঠাট্টাচ্ছলে কস্তুরীকে ডেকেছি আমি। কস্তুরী নামে ডাকার সাহসও ছিল না আমার। তা ছাড়া, কস্তুরী বিবাহিতা মহিলা— অপর পুরুষের ঘরনী। কিন্তু জনা তো আমারই, একান্তভাবে আমার। জলের মধ্যে, মুখের পরতে পরতে মৃত্যুর ছায়া নিয়ে ডুবন্ত কস্তুরীকে আমিই তো দু-হাতে জাপটে ধরে টেনে এনেছি জীবনের আঙিনায়...

কিন্তু এ কী বোকামো করেছি আমি... শূন্যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুলে আশা-নিরাশার নিরন্তর দ্বন্দ্বে কেন ক্ষতবিক্ষত করছি মনকে? কিন্তু তাতে কী আসে যায়! বেদনা-দরিয়ার নিতলে আছে শান্তি; অনাবিল সুখ আর অফুরন্ত আনন্দের সত্যলোক। আশা-নিরাশার জাল বুনে বরং তার উপকারই হয়েছে। ব্যর্থতার তিক্ততায় সম্প্রতি যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল আমার অন্তর প্রকৃতিতে, তা আর নেই। সে ভয় নেই। অনুশোচনা নেই। না জানি কত দীর্ঘ বছর প্রতীক্ষায় থেকেছে আমার নিঃসঙ্গ সত্তা, এই অপরূপা নারীর জন্যে। সম্ভবত বারো বছর বয়স থেকেই শুরু হয়েছিল শবরীর প্রতীক্ষা। পম্পা তীরে মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে জটাবতী চির-অজিন-ধারিণী শবরী রামের আগমন প্রতীক্ষায় থেকেছে দীর্ঘকাল। আর ছেলেবেলা থেকেই পাহাড়ের গুহায়, ছায়ায়, অন্ধকারে ঘুরঘুর করে, মৃত্যু-স্তব্ধতার মধ্যে থেকে অশরীরী কল্পনায় বিভোর হয়ে দিন গুণেছি আমি।

ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। ঝট করে তুলে নিলাম রিসিভারটা।

'হ্যালো... আপনি?... হাতে কাজ নেই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব বলেই মনে হয়। কাজ আছে অনেক, কিন্তু কোনওটাই জরুরি নয়... আপনি হুকুম করলে অবশ্য... চমৎকার; কিন্তু পাঁচটার আগেই ফিরে আসতে চাই... কোথায় যাবে? ঠিক আছে, মিউজিয়াম? মার্বেল প্যালেস? না, পরেশনাথ মন্দিরে হাওয়া খাওয়া?... না, না, এখনও দেখার জিনিসের অভাব নেই— তাহলে দুটোর সময়ে।'

আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলাম রিসিভারটা। এমনভাবে রাখলাম যেন এখনও কস্তুরীর বীণাকণ্ঠের শেষ অনুরণন রিমঝিম রিমঝিম সুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যন্ত্রটির মধ্যে।

জামাটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মক্কেলরা এসে ফিরে যাক আরও একদিন— একেবারে না এলেই তো পারে! কী এসে যায় তাতে। যুদ্ধের দামামা বাজছে ভারতের বাইরে। রণ-প্রস্তুতি বাংলার মাটিতেও। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় কত রকম প্রস্তুতিই চলছে শহরের বুকে। বসন্তের লালিমা বুকে নিয়ে সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে সবুজ ঘাসপাতা। প্রেমের সুষমা যেন সূর্যের সোনাগলা কিরণের মধ্য দিয়েই ঝরে ঝরে পড়ছে। এসপ্ল্যানেডের দিকে পা চালালাম আমি।

মনের দিক দিয়ে আমি সত্যিই নিঃশেষিত হয়ে গেছি। তাই অবসন্ন মনে এদিকে ওদিকে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম স্নায়ুগুলোকে আবার সতেজ করে তোলার চেষ্টায়। চিন্তার স্রোতে ছেড়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। অবাধ্য, দুরন্ত চিন্তা, মগজকে শাসনের রক্তচক্ষু

দেখিয়ে কোনও লাভই নেই... তার চাইতে বরং এই ভালো। হঠাৎ চমক ভাঙল একটা সাজানো দোকানের সামনে এসে। নিউ মার্কেটের দোকান। হরেকরকম বিচিত্র পণ্য থরেথরে সাজানো কাচের ওদিকে। একটা ছোট্ট আয়নায় চোখ পড়ল। রোজউডের ওপর হাতির দাঁতের কাজ-করা ফ্রেমে বাঁধানো এতটুকু আয়না— মুঠোর মধ্যে ধরা যায়, এত ছোট। কস্তুরীকে উপহার দিতে হবে সামান্য এই জিনিসটা। আজই দেব। জনার লাবণ্যকে প্রতিফলিত করার যোগ্যতা তো সব দর্পণের নেই। নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা মোড়কে আয়নাটাকে পকেটে রেখে হাসিমুখে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কস্তুরী, কস্তুরী, প্রিয়তমা কস্তুরী!

দুটোর সময়ে ময়দানে সেই বিশেষ বকুলগাছটার নীচে এসে দাঁড়ালাম। সময়ের হিসেবে কস্তুরীও কম যায় না। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে-ও এসে পৌঁছোল বকুলতলায়।

আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে যাই আমি, 'কী ব্যাপার, আজ যে আগাগোড়া কালোর সমারোহ!'

'কালোকে আমি ভালোবাসি। কালোই হল আমার আঁধারের বাতি। 'পররুচি পরনা' প্রবাদের অস্তিত্ব না থাকলে কালো ছাড়া আর কিছুই পরতাম না আমি।'

'কিন্তু রংটায় শোকের ছায়া রয়েছে, তা-ই নয় কি?'

'নিশ্চয় নয়। বরং উলটোটাই বলা যায়। জীবনের সব কিছু মধ্যেই একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায় এই কালো রঙের মাধ্যমে। এই রং আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে মানুষের চিন্তাকে, জীবন-দর্শন হয়ে ওঠে গম্ভীর ও গভীর।'

'আর যদি নীল কি সবুজ রং পরেন?'

'জানি না, তখন কী ভাবব। হয়তো নিজেকে মনে করব অকালের ওই উড়ন্ত টিয়াপাখি, অথবা এই বকুলগাছটার মতোই সৌরভ বিতরণই আমার কাজ... বিভিন্ন রঙের কতকগুলো রহস্যময় ধর্ম আছে, খুব ছোটবেলা থেকেই ভাবতাম আমি। বোধহয় সেই কারণেই ছবি আঁকা শুরু করেছিলাম।'

'আমিও ছবি আঁকতাম। কিন্তু আমার ড্রইং এতই দুর্বল যে শেষ পর্যন্ত—'

'তাতে কী? রংটাই তো আসল।'

'আপনার আঁকা ছবি দেখাবেন?'

‘দেখার মতো কিছু নয়। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝবেন না আপনি। নিছক স্বপ্নকে তুলির ডগায় আনতে চেষ্টা করেছি... স্বপ্নের রং... আচ্ছা, স্বপ্নের মধ্যে অনেক রকম রং দেখেন না আপনি?’

‘না। সমস্ত ধুলোর মতো ধূসর, অথবা ফোটোগ্রাফের মতো।’

‘তাহলে আপনি বুঝবেন না, আপনি অন্ধ!’ বলে হেসে উঠল কস্তুরী। আলতো করে আমার হাতটা টিপে দিয়ে জানিয়ে দিল এ শুধু পরিহাস, আর কিছু নয়। তারপর বলল, ‘স্বপ্ন বাস্তবের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর। কল্পনা করুন, অনেকগুলো অদ্ভুত সুন্দর রং এক জায়গায় মিলেমিশে অপরূপ সুষমা নিয়ে এসে পড়ছে আপনার চোখে... আপনার গোটা মনটা ভরে উঠবে রঙের সাগরে... তখন নিজেকে মনে হবে মেকি... ওই রংই আসল। প্রত্যেক রাত্রে স্বপ্ন দেখি আমি... আরেক দেশের স্বপ্ন।’

‘তা-ই নাকি?’

ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটতে থাকি দু-জনে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। জানি না কোথায় চলেছি, জানার ইচ্ছেও নেই। এই তো ভালো, আমেজে অবশ পদযুগল যেদিকে যায় যাক। বড় ভালো লাগে কস্তুরীর আজকের নিবিড় সাহচর্য। কিন্তু কর্তব্য ভুলি না। বলি, ‘ছেলেবেলায় অজানা জগতের চিন্তা আমাকেও পেয়ে বসেছিল। কাছে ম্যাপ থাকলে দেখিয়ে দিতাম ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সে দেশের।’

‘এ দেশ, সে দেশ নয়।’

‘তা তো নয়ই। আমার স্বপ্নের শেষে আছে অন্ধকার, আর আপনার স্বপ্নের শেষে আছে রঙের বাহার। কিন্তু দুটো স্বপ্নই মিলেছে একই জায়গায়, একই দেশে।’

‘তখন আপনি ছেলেমানুষ ছিলেন। এখন আর তা বিশ্বাস করেন না। করেন কি?’

‘করি... আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে করছি।’

নীরবে কিছুক্ষণ হাঁটি দু-জনে। সমবেত সঙ্গীতের মতোই ছন্দে ছন্দে তালে তালে দু-জনের পা পড়তে থাকে ঘাসজমির ওপর। চিন্তাধারাও এগিয়ে চলে একই সুরে। মিউজিয়ামের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই। তারপর রাস্তা পেরিয়ে বিশাল তোরণের নীচ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকি দু-জনে।

বড় বড় পাথরের মূর্তিগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে কস্তুরী বলে, ‘এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। আমি জানি... স্বপ্নে দেখা সেই দেশ হুবহু এই দেশের মতো নয়। কিন্তু তবুও

কাউকে তা বলা যায় না।’

বড় বড় শূন্য দৃষ্টি মেলে পাথরের মূর্তিগুলো তাকিয়ে রইল আমাদের পানে। পাথরের ব্লকে কত দুর্বোধ্য হরফ, বহু বছর আগেকার দেব-দেবী দানব-দানবী পশুপক্ষীর বিচিত্র প্রস্তর-আলেখ্যগুলোও সেদিন নীরব সাক্ষী থাকে কস্তুরীর গোপন রহস্যের।

‘এর আগেও এখানে এসেছি আমি। অনেক... অনেকদিন আগে। আমার পাশে ছিল আরেকজন পুরুষ... কালো চাপদাড়ি ছিল তার গালে।’ বিড়বিড় করে বলে কস্তুরী।

‘ওটা মনের ভুল। অনেকের ক্ষেত্রেই এরকম ‘আগে দেখেছি’ ভাব দেখা গেছে। ও কিছু নয়, খুবই সাধারণ ব্যাপার।’

‘না, মনের ভুল নয়। প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি আমি আপনাকে শোনাতে পারি— প্রত্যেকটা দৃশ্য ছবির মতো ভাসছে আমার চোখের সামনে। যেমন ধরুন না কেন, এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভাসছে ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামটার নাম বলতে পারব না; বাংলাদেশে কি না তাও বলতে পারবে না। প্রায় স্বপ্নের মধ্যে দেখি, এই গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি... ছোট্ট একটা নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে গাঁয়ের ঠিক পাশ দিয়ে... ডান পারে আছে একটা অনেক পুরোনো শিবমন্দির... বাঁ পারে সারি সারি তালগাছ... তালগাছের ওপাশে আমবনে ঘুরছে কয়েকটা ছাগল... তার ওপাশে একটা ভাঙা কেল্লা... আধখানা বুরুজ দেখা যাচ্ছে আমবনের মাথার ওপরে...’

‘কিন্তু... এ গাঁ তো আমার চেনা। গাঁয়ের নাম রতনপুর। নদীর নাম মন্দাকিনী।’

‘তা হবে।’

‘কিন্তু এখন গেলে ভাঙা কেল্লার বিশেষ কিছু আর দেখা যাবে না। বুরুজটাও পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। তালগাছগুলো সাফ হয়ে গেছে।’

‘তখন ছিল গাছগুলো... আমার সময়ে ছিল... আর সেই বটগাছটা?... যে গাছের শেকড় বালিশের তলায় রেখে বন্ধ্যা বউরা ঘুমোত?

‘ভীমা বট।’

‘দেখলেন তো?’

আরও কতকগুলো বড় ঘর পেরিয়ে এলাম। দু-জনেই নীরব। ডাইনোসরের মস্ত কঙ্কালটাও কারও মনে বিস্ময় জাগাতে পারলে না।

‘কী নাম বললেন?’ শুধোল কস্তুরী।

'গাঁয়ের নাম? রতনপুর।'

'একসময়ে নিশ্চয় সেখানে থাকতাম আমি।'

'যখন খুব ছোট ছিলেন।'

'না,' শান্ত সুরে বললে কস্তুরী, 'গত জন্মে।'

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর, 'জায়গাটা আপনি চিনলেন কী করে?' শুধোল কস্তুরী।

'আমি জন্মেছি সেই গ্রামে। এখনও মাঝে মাঝে যাই।'

বড় বড় আলমারিগুলোর ওপর শূন্য দৃষ্টি রেখে শুধোই— 'ছেলেবেলা থেকেই আপনি এই স্বপ্ন দেখছেন?'

'না। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই ছিলাম আমি। তবে অল্প কথা বলতাম, একা থাকতে ভালোবাসতাম।'

'তাহলে... শুরু হল কখন?'

'হঠাৎ! বেশিদিন আগে নয়... আচমকা একদিন মনে হল আমি যেন আমার বাড়িতে নেই, একজন অচেনা লোকের সঙ্গে রয়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অচেনা জায়গায় নিজেকে দেখে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, এও অনেকটা তেমনি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যদি রাগ না করেন তো, বলি।'

'আমার কোনও গোপন কথা নেই,' শান্ত স্বরে বলল কস্তুরী।

'তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

'আপনি কি... মানে, আবার শেষ-যাওয়ার কথা চিন্তা করেন?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল কস্তুরী। ভাসা ভাসা মায়াময় দুই চোখে মেলে তাকাল আমার পানে।

'আপনি বুঝতে পারলেন না আমাকে।' বলল ফিসফিস করে।

'ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।'

খনিজ আকরের একটা শো-কেসের চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল অনেকগুলো মেয়ে আর ছেলে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি।

কস্তুরী বলল, 'উত্তরের জন্যে চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়।'

‘আমি দেব। দেব শুধু আপনার স্বার্থে নয়, আমারও স্বার্থে।’

‘প্লিজ...’

এত নরম সুরে বলল কস্তুরী যে বাতাসের মতোই তা ভেসে এল কানে। মনটা হঠাৎ কী রকম হয়ে গেল। এক হাত দিয়ে কস্তুরীকে ঘিরে ধরে নিজের কাছে টেনে আনলাম। বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। কেউ নেই। বললাম গাঢ় স্বরে, ‘তুমি কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছ না আমি তোমায় ভালোবাসি? তোমাকে হারানোর শোক যে আমি সহ্য করতে পারব না কস্তুরী।’

যন্ত্রচালিত মানব-মানবীর মতো পাশাপাশি হেঁটে চললাম দু-জনে।

কতক্ষণ পরে কানের কাছে মুখ এনে বললাম ফিসফিস স্বরে, ‘তোমাকে আমার চাই... তোমাকে আমার দরকার... আমার এই তুচ্ছ বেঁচে থাকাকে ঘৃণা করার শিক্ষা তোমার কাছ থেকেই পেতে চাই আমি...’

‘চলুন যাওয়া যাক।’

ঘরের পর ঘর পেরিয়ে এলাম। একদম গা ঘেঁষে অত্যন্ত নিবিড় হয়ে হাঁটছিল কস্তুরী। আগেই চাইতে উষ্ণ সেই সান্নিধ্য। সিঁড়ির ওপর পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

‘এইমাত্র কী বললাম তোমাকে, তা মনে আছে নিশ্চয়?’

‘আছে।’

‘আবার যদি তা বলি, রাগ করবে কি?’

‘না।’

‘জনা, আমার জনা!... আরও কিছুক্ষণ হাঁটলে হয় না? অনেক কথাই বলার রয়েছে দু-জনের।’

‘আজ থাক। আমি ক্লান্ত। এখন বাড়ি যাই।’

বাস্তবিকই একটু ফ্যাকাশে আর শঙ্কিত মনে হল কস্তুরীকে।

‘ট্যাক্সি ডাকছি। তার আগে আমার একটা ছোট উপহার আছে।’

‘কী?’

‘খুলে দেখো। আমার সামনেই খোলো।’

মোড়কটা খুলে ফেলল কস্তুরী। ছোট্ট অথচ সুন্দর আয়নাটার। বুকে নিজের প্রতিবিম্বর ওপর ক্ষণেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুতোয় ঝোলানো কার্ডটা তুলে ধরলে। শুধু তিনটে শব্দ

লেখা ছিল কার্ডে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কস্তুরী।

বলল, ‘চলুন।’

‘আগামীকাল দেখা হচ্ছে তো?’

মাথা কাত করে সায় দিল কস্তুরী।

‘কলকাতার বাইরে যাওয়া যাবে’খন... না, না, আর কোনও কথা নয়। আজকের বিকেলের এই স্মৃতিটুকু নিয়ে আমাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে শান্তিতে থাকতে দাও... এই যে ট্যাক্সি... আর একটা কথা... অতীতের দিকে আর ফিরে চেও না।’ বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

অবসাদের ছোঁয়া আমার মনেও লেগেছিল। এ অবসাদ অনাবিল প্রশান্তির... ক্লান্তির নয়।

(৫)

হঠাৎ ঘুম .ভঙে গেল... আওয়াজটা পরিচিত... সাইরেন। আশপাশের ফ্ল্যাটে দুমদাম শব্দ হচ্ছে দরজা খোলা আর বন্ধ করার। নীচের তলায় ছুটেছে সবাই। অন্ধকার শহরকে তোলপাড় করে সত্যিকারের ডাকিনীর মতো নাকি সুরে কাঁদছে সাইরেন। আঁতকে উঠেছে ভয়ার্ত নাগরিকেরা। ভীতু! পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

পরের দিন সকালে রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে শুনলাম সেই একই খবর—যুদ্ধ, যুদ্ধ, আর যুদ্ধ। সারা পৃথিবী জুড়ে বাজছে রণদামামা। দ্রিমিদ্রিমি শব্দ ভারতের শিয়রে হাজির। হাসি পেল। বোমার ভয়ে শহর প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। বোম আদৌ পড়বে কি না তারই ঠিক নেই, কিন্তু বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে এর মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে পালাতে শুরু করেছে কলকাতার বীরপুরুষরা। খিদে পেয়েছে— চনমন করছে পাকস্থলী। শরীরে ক্লান্তি বলে আর কিছুই নেই। ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। কস্তুরীর। সেই একই সাক্ষাৎস্থান। বেলা দুটো।

সারা সকালটা চটপট কাজ করে গেলাম। মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করলাম। টেলিফোনের ঘ্যানঘ্যানানিতেও বিরক্ত হলাম না। সবার স্বরেই সেই একই উত্তেজনা— যে উত্তেজনা রয়েছে আমার নিজের মধ্যেই। বোমার প্যানিক আরও ছড়িয়ে পড়েছে। দুপুর একটার মধ্যে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে খাওয়া সেরে নিলাম। কফির কাপ নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারলাম কিছুক্ষণ। তারপর পৌঁছলাম বকুলতলায়।

কস্তুরী আগেই এসে গেছিল। কিন্তু এ কোন শাড়ি পরেছে ও? সাদাসিধে বাদামি রঙের সেই তাঁতের শাড়ি... ভয়াবহ সেই দিনটিতে কস্তুরীর অঙ্গে ছিল এই শাড়িটিই... মুহূর্তের

জন্যে শক্ত মুঠোয় কস্তুরীর কবজি চেপে ধরি আমি। বলি, ‘শরীরটা আজ বিশেষ ভালো নেই। জাপানিদের ভয়ে অবশ্য নয়। তুমি চালাও।’

কস্তুরীকেও বিশেষ সুস্থ বলে বলে মনে হল না; গাড়ি চলতেই তা বুঝলাম— গিয়ার চেঞ্জ করছে আওয়াজ করে, ব্রেক কষছে আচমকা, স্ট্রিয়ারিংয়ের ওপর পালিশ-করা নখগুলোও খুব স্থির বলে মনে হল না।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে কস্তুরী বললে, ‘চলো, অনেকদূর কোথাও যাই। খুব সম্ভব এই আমাদের শেষ ড্রাইভিং।’

‘কেন?’

‘কী যে হবে, তা বলা মুশকিল। যা-ই হোক না কেন, আমাকে হয়তো কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে।’

‘কলকাতা ছেড়ে যাবে কেন? বোমা পড়ার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই কম। অনেক দিন ধরেই সাইরেন বাজছে শহরে— কিন্তু বোমা পড়েছে কি?’

কোনও জবাব নেই।

‘তবে কি আমার জন্যেই... আমার জন্যেই তুমি? কস্তুরী, তোমার জীবনে আর শনি হয়ে থাকতে চাই না আমি। দাও... কথা দাও, যে চিঠি তুমি একবার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে, সে চিঠি যেন আর দ্বিতীয় বারের জন্যে তোমার হাতে লেখা না হয়... কী বলতে চাই তা বুঝছ নিশ্চয়?’

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলে কস্তুরী। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ওভারটেক করল একটা লরিকে। চিড়িয়ার মোড়ের ওপর দিয়ে খসে-পড়া উল্কার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। তারপরেই কমে এল গতি।

সামনের রাস্তার ওপর চোখ রেখে উত্তর দিলে কস্তুরী, ‘ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর না-ই বা আলোচনা করলে?’ একটু থেমে মিনতি মাখানো গলায় আবার বললে, ‘কিছুক্ষণের জন্যে যুদ্ধ আর বোমাকেও ভুলে যাও।’

‘কিন্তু কস্তুরী, তোমার মনে আনন্দ নেই কেন?’

জোর করে হাসবার চেষ্টা করল কস্তুরী, ফ্যাকাশে হাসি। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে আমার।

'কিছুই হয়নি আমার— দিব্বি মুডে আছি। সত্যি বলছি। দেখছ না, কীরকম ড্রাইভ করছি? মেজাজ খারাপ থাকলে কি এমনভাবে বেরোনো যায়? এমনিভাবেই যেখানে খুশি যেতে ইচ্ছে যায়, না ভেবেচিন্তে সামনে যে রাস্তা পাওয়া যায়— সেই রাস্তা ধরেই উধাও হয়ে যেতে চায় মনটা। মাঝে মাঝে ভাবি, জানোয়ার হয়ে জন্মালাম না কেন।'

'বলছ কী কস্তুরী!'

'একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জন্তুদের আমি অনুকম্পা তো করিই না, বরং হিংসে হয় ওদের খুশিমতো চলার স্বাধীনতা দেখে। খায়, ঘুমোয়, ছুটে বেড়ায়— নিষ্পাপ, নিরীহ। অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই।'

'এ কী জীবনদর্শন!'

'একে দর্শন বলে কি না, তা জানি না। কিন্তু ওদের দেখলেই ঈর্ষা হয় আমার।'

এরপর টুকরো টুকরো কথা ছাড়া আর কিছু জমল না। পেছনে পড়ে রইল বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর। পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে নির্বিকারভাবে যাচ্ছিল একটা মোষ। বেপরোয়াভাবে আচমকা ডানদিকে নেমে গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তার ওপর গাড়ি নামিয়ে দিল কস্তুরী। পরক্ষণেই লাফাতে লাফাতে উঠে পড়ল সড়কে। ঝাঁকুনির চোটে গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলাম। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা থরথর কবে কাঁপছে পঞ্চান্ন থেকে ষাট-এর মধ্যে। কস্তুরীর চোখে-মুখে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই এ-হেন সর্বনাশা বেগের। চোখের ওপর কয়েকগাছি চুল লেপটে ছিল— থিরথির করে কাঁপছিল দমকা হাওয়ায়— কিন্তু তা সরাবার কোনও প্রচেষ্টাই দেখা যাচ্ছিল না ওর মধ্যে। হুইলের ওপর হাত দুটি রেখে বসেছিল যন্ত্রের মতো। শ্যামনগরের কাছাকাছি ঠেলাগাড়ি নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল একজন মুসলমান। বুড়োকে সরে যাওয়ার কোনও সময় না দিয়ে সাঁ করে ডান দিকের একটা সরু পথে নেমে পড়ল কস্তুরী। একটা পরিত্যক্ত ইটের পাঁজা পড়ে রইল পেছনে। সামনে একটা চৌমাথা। ডান দিকেই মোড় নিল কস্তুরী— খুব সম্ভব সেদিকের ঝোপঝাড়ের রাশি রাশি ফুলের আকর্ষণে। বাঁশের বেড়ার ওপাশ থেকে কালো কালো ছোপওয়ালা একটা ধলা গাই বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল নৃত্যপর গাড়িটার দিকে।

এমনভাবে ড্রাইভ করছে কস্তুরী, যেন একটু আস্তে চালালেই দেরি হয়ে যাবে। অথচ তাড়াহুড়ো করার কোনও কারণ নেই। কাঁচা মাটির গর্তের ওপর দিয়ে তাই নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল চার চাকার যন্ত্রযান। ঘড়ির ওপর চোখ নামালাম; এবার গাড়ি থামানো

দরকার। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথার ছলে জেনে নেওয়া যাবে, কেন কস্তুরীর মন আজ এত উতলা। কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা করছে ও। মনের গহনে এমন একটা জিনিস লুকিয়ে রেখেছে, যা দ্বিতীয় প্রাণীকে বলতে পারেনি। খুব সম্ভব বিয়ের আগে থেকে চলে এসেছে এই গোপনীয়তা। না বলার যাতনার বনিয়াদের ওপরেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ওর যত কিছু অস্বাভাবিক আচরণ। তীব্র অনুতাপের দহনও তো থাকতে পারে মনের গহনে। কস্তুরী অসুস্থ নয়, উন্মাদ নয়, ছলনাময়ী নয়। তা সত্ত্বেও এমন কোন রহস্য আছে ওর অতীত জীবনে যা কাউকে বলা যায় না, এতদিন কাউকে বলতেও পারেনি— স্বামীকেও নয়। যতই এই নিয়ে ভাবতে লাগলাম, ততই চিন্তাধারার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। কিন্তু কোন অপরাধে অপরাধিনী সে? নিশ্চয় গুরুতর কিছু।

'চেনো ওই বুরুজটা?' আচমকা প্রশ্ন করে কস্তুরী, 'কোথায় এসেছি বলো তো?'

'কোনটা?... ইয়ে... ওই বুরুজ?... না... এদিকে কোনওদিন আসিইনি। এবার থামা যাক, সাড়ে তিনটে বাজল।'

সামনেই একটা চত্বর— এক সময়ে তা পাথরে বাঁধানো ছিল, কিন্তু আজ তা এবড়ো খেবড়ো ঘেসো জমিতে পরিণত হয়েছে। চত্বরের মাঝেই বেজায় উঁচু বুকটা পেছনের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে কেমন-জানি বেমানান ঠেকছিল। পেছনে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যাচ্ছিল, নিশ্চয় তা পরিত্যক্ত নীলকুঠির।

চত্বরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল কস্তুরী।

'অদ্ভুত গড়নটা। হঠাৎ দেখলে মুসলমান আমলের মিনারের মতো, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে ফিরিঙ্গিদের ওয়াচ টাওয়ার। তা-ই না?' বলে কস্তুরী।

'বেজায় উঁচুও বটে।

পায়ে পায়ে বুরুজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কালের শাসনে নীলকুঠি ভেঙে পড়লেও পরবর্তীকালে বহু মেরামতের চিহ্ন সারা অঙ্গে নিয়ে নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বুরুজটা। ভেতরে ঢুকে পড়লাম দু-জনে।

ফিসফিস করে বললে কস্তুরী, 'কেউ এদিকে আসে না, কিন্তু আগাছাও বিশেষ দেখছি না। বুরুজের বর্তমান মালিকের প্রাণে শখ আছে বটে— পিকনিক করার উপযুক্ত জায়গা।'

তা-ই বটে। ভাঙাচোরা নীলকুঠি, লম্বা লম্বা গাছপালার ঘেসো চত্বর আর পুরোনো বুরুজ — সব মিলিয়ে আইডিয়াল প্লেস। ভেতরে ঢুকলাম অত্যন্ত মন্থর পায়ে। পাথরের বেদীর ওপর সিঁদুর মাখানো একটা কালো শিলার সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কস্তুরী। পরক্ষণেই হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে চোখ মুদে মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ। বাতাসের ছোঁয়া লেগে গোলাপের পাপড়ি নড়ার মতো অধরোষ্ঠে মৃদু কম্পন দেখে, পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কীসের প্রার্থনা? কীসের অনুশোচনা? কোন আত্মগ্লানি? গঙ্গার জলে তলিয়ে গিয়ে কি সেদিন রৌরব পথযাত্রিণী হতে চেয়েছিল রহস্যময়ী কস্তুরী? আর কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, নতজানু হয়ে বসে পড়লাম পাশে, 'কস্তুরী।'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল কস্তুরী; কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'কী হয়েছে? কস্তুরী, বলো আমাকে... কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি।' ফিসফিস করে উঠল কস্তুরী। 'দুর্লভ, তুমি বিশ্বাস করো, এ দুনিয়ায় কিছুরই শেষ নেই, কিছুই একেবারে শেষ হয়ে যায় না। আমরা মনে করি, এই শেষ... কিন্তু তা নয়...' বলে অনেকক্ষণ দুই করতলে মুখ লুকিয়ে রইল কস্তুরী। তারপর ভাঙা গলায় বললে, 'চলো, যাওয়া যাক।'

উঠে দাঁড়িয়ে কালো শিলার উদ্দেশে আর একবার কপালে দু-হাত ঠেকাল ও। কনুই ধরে টান দিলাম আমি।

কোণের দিকে একটা কাঠের তক্তা-মারা দরজা, দরজার পরেই ঘুরপাক-খাওয়া বাংলা-ইটের সিঁড়ি।

'কস্তুরী, ও দরজা নয়— ও সিঁড়ি ওপরে গেছে।'

'চারপাশটা একটু দেখতে চাই।' জবাব দিল কস্তুরী।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

'মিনিট খানেকের জন্যে উঠব আমি। বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল ও, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিঁড়িতে পা দিলাম।

'অত তাড়াতাড়ি যেও না, কস্তুরী।'

সঙ্কীর্ণ খিলানওয়ালা সিঁড়ি-পথে গমগম করে উঠল আমার কণ্ঠস্বর। কিন্তু শুনেও শুনল না কস্তুরী— দ্রুততর হয়ে উঠল ওর চরণ। ছোট্ট একটা চাতালে পৌঁছে দেওয়ালের

ফোকর দিয়ে বাইরে তাকালাম— নীলকুঠির ভাঙা ছাদ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তালগাছের সারি, তার ওপাশে মাঠে কাজ করছে কয়েকজন চাষী। এইটুকু উঁচুতে উঠেই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ফোকর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার পা দিলাম সিঁড়ির ধাপে।

'কস্তুরী... দাঁড়াও... আমাকে উঠতে দাও।'

বেদম হয়ে পড়েছিলাম আমি। দপদপ করছিল মাথার শিরাগুলো। আর একটা চত্বর; আর একটা ফোকর। এবার হুঁশিয়ার হয়ে গেছি— বাইরে তাকালাম না; চোখ রাখলাম ভেতর দিকে— নীচের দিকেও নয়। খাড়াই ধাপগুলো এমনভাবে গোঁৎ খেয়ে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে যে, দেখলেই গা শিরশির করে ওঠে। বুরুজের চারপাশে কাকের কর্কশ চিৎকার শুনতে পেলাম। ঝোঁকের মাথায় উঠে তো পড়লাম, নামব কী করে?

'কস্তুরী!'

উদ্বেগে কী রকম ভাঙা ভাঙা শোনাল নিজের স্বর। শেষকালে কি এই অন্ধকারের মধ্যে ছেলেমানুষের মতো গলা ছেড়ে কেঁদে উঠতে হবে? ফোকরটার মধ্যে দিয়ে আলোর তির্যক রেখা চোখে পড়ছিল। জানি ও-জায়গায় চোখ রাখলে মাথা ঘুরে উঠবে। তবুও ফোকরটার কাছে এসে বাইরে না তাকিয়ে পারলাম না। গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে এসেছি। নীলকুঠি আরও ছোট হয়ে এসেছে। শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বাইরের হাওয়া ফোকর দিয়ে আছড়ে পড়ছে মুখের ওপর। চাতালের সামনেই একটা দরজা। বন্ধ দরজা। ঠেলা দিয়েও খুলতে পারলাম না। এখনও চুড়োটা আসেনি। দরজার ফাঁক দিয়েই দেখা যাচ্ছিল আর এক পাক ঘুরে উঠে গেছে সিঁড়ির সারি। কিন্তু সিঁড়ির পাশে দেওয়াল আর নেই— খোলা আকাশ।

'কস্তুরী!... দরজা খোলো।'

ক্ষিপ্তের মতো পাল্লার ওপর ঘুঁষি মারতে লাগলাম। মতলব কী কস্তুরীর? কী করতে চায় ও?

'কস্তুরী... কস্তুরী!' পাগলের মতো চেঁচাতে থাকি আমি। 'এ কাজ কোরো না... কোরো না... আমার কথা শোনো!'

ব্যঙ্গ করে উঠল প্রতিধ্বনি। গমগম করে উঠল গোটা বুরুজটা। ক্ষিপ্তের মতো ফিরে দাঁড়ালাম ফোকরটার দিকে। না, ফোকর ঠিক নয়, গবাক্ষ বলা যায়। বেশ বড় আকারের। কষ্টে-সৃষ্টে বেঁকে দুমড়ে একটা মানুষের দেহ বেরিয়ে যেতে পারে। তারপরেই ফুটখানেক

চওড়া আলসেটায় পা দিয়ে দেওয়াল আঁকড়ে ঘুরে গেলেই দরজার ওদিকে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছোন যায়। চেষ্টা করলে যাওয়া যায় নিশ্চয়... যে কোনও পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব... কিন্তু আমার পক্ষে তা অসম্ভব! গেলেই পড়ব... মাথা ঘুরে পড়ে যাব... না, এ পথে যাওয়া অসম্ভব!

'কস্তুরী! কস্তুরী!' বিকট ভাঙা গলায় আবার চেঁচিয়ে উঠলাম। আবার— আবার।

উত্তরে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ আর্ত-চিৎকার। সাঁ করে ফোকরের সামনে দিয়ে নেমে গেল একটা ছায়া। সজোরে আঙুলের গাঁট কামড়ে ধরে নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে সময় গুনতে লাগলাম— ছেলেবেলায় এমনিভাবেই বিদ্যুৎ আর বাজের আওয়াজের মাঝের সময় গুনতাম আমি।

ভেসে এল সেই বজ্রনির্ঘোষ... বহু নীচ থেকে একটা ভয়ংকর শব্দ। মৃত্যুপথযাত্রীর মতো দম আটকে-যাওয়া আকুল কণ্ঠে বারবার ককিয়ে উঠলাম—

'কস্তুরী... কস্তুরী... না... না... না...'

বসে পড়েছিলাম। দাঁড়িয়ে থাকার বিন্দুমাত্র শক্তিও ছিল না হাঁটুতে। মনে হল, এবার জ্ঞান হারাব। না দাঁড়িয়েই বসে বসে একটু একটু করে দেহটাকে টেনে টেনে নামাতে লাগলাম নীচে— এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে— এক চাতাল থেকে আর এক চাতালে। শামুকের মতো গতি... কিন্তু এর বেশি আর কিছু করার ক্ষমতাও ছিল না। গোঙাতে লাগলাম আতঙ্কে আর অপরিসীম নিরাশায়। প্রথম চাতালে নেমে একবার ফোকর দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। হাঁটু গেঁড়ে বসে উঁকি দিয়েছিলাম গবাক্ষের মধ্য দিয়ে বাইরে।

অনেক নীচে বাঁ-দিকে ভাঙা পাথরের টুকরো আর ঘাসজমির ওপর, ভীষণভাবে খাড়াই বুরুজের দেওয়ালের প্রায় গা ঘেঁষে পড়েছিল বীভৎসভাবে দোমড়ানো মোচড়ানো আকারহীন কুৎসিত বাদামি কাপড়ের একটা পিণ্ড।

পাথরের ওপর খানিকটা রক্ত, একটা হাঁ-করা ভ্যানিটি ব্যাগ— ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট্ট একটা আয়না।

অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে গেল সবকিছু। দেহটার কাছে যাওয়ার কথাও আর ভাবতে পারলাম না। কস্তুরী মারা গেছে। সেই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে দুর্লভ সামন্তর।

(৬)

দূর .থকেই ঝাপসা চোখে তাকালাম নিষ্প্রাণ দেহটির দিকে। বুরুজ থেকে বেরিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু আর এক পা-ও এগোবার সামর্থ্য ছিল না। মনে পড়ল একদিন বিড়বিড় করে বলেছিল কস্তুরী, 'মরতে আমার ভালো লাগে।'

ইসমাইলের সম্বন্ধে সবাই তা-ই বলেছিল। কস্তুরীর মতোই মাথা নীচের দিকে করে আছড়ে পড়েছিল সে। যন্ত্রণা ভোগ করার কোনও সময়ই পায়নি। সত্যিই কি তা-ই? ফুটপাতের পাথরে থেঁতলে গেছিল ইসমাইলের মাথা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়েছিল চারপাশে...

আর ভাবতে পারলাম না। হাসপাতালে গিয়ে ইসমাইলের দেহাবশেষ দেখেছিলাম। কস্তুরীর চাইতেও কম উঁচু জায়গা থেকে পড়েছিল সে। কল্পনায় সেই ভয়ংকর সংঘর্ষ প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে উপলব্ধি করলাম... প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো আচমকা রেণু রেণু হয়ে গেছিল মনটা— অণুপরমাণুতে গুঁড়িয়ে যাওয়া মূল্যবান আয়নার মতোই। পোশাকের একটা প্রাণহীন দলা ছাড়া কস্তুরীরও আর কিছু অবশিষ্ট নেই!

জোর করে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। অসহ কষ্ট হলেও আমাকে দেখতে হবে এই দৃশ্য। এ ঘটনার জন্যে দায়ী আমি নিজেই— না দেখে পালানোর পথ কি আছে? অশ্রুপর্দার মধ্যে দিয়ে একটা ঝাপসা ছবি দেখলাম। দেখলাম, পাগলিনীর মতো চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে চোখে-মুখে-বুকে; ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে রুধিররঞ্জিত তিলোত্তমানিন্দিত মুখটি; যেন মোম দিয়ে গড়া একটি হাত ছড়িয়ে রয়েছে জমির ওপর— অনামিকায় চিকমিক করছে একটি আংটি। সামর্থ্যে কুলোলে ওই আংটিটি খুলে নিয়ে

আসতাম, আমৃত্যু ধারণ করতাম নিজের আঙুলে। কিন্তু সে-শক্তি নেই আমার। তাই কুড়িয়ে নিলাম শুধু আয়নাটা।

একটু একটু করে পিছু হটে এলাম। নির্নিমেষ দৃষ্টি রইল নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ডটির ওপর— এমনভাবে তাকিয়ে রইলাম যেন ও দেহের প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি আমি স্বয়ং। আচম্বিতে ভয়ানক ভয় ঘিরে ধরল আমাকে— এ ভয় সামনের ওই বীভৎস তালগোল পাকানো দেহটিকে নিয়ে। কর্কশ শব্দে কা-কা করে ওপর দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা কাক।

পেছন ফিরেই দৌড়োলাম। হাতের শক্ত মুঠোয় ঘেমে উঠেছিল আয়নাটা। এক দৌড়ে চত্বর পেরিয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে।

সব তো শেষ হয়ে গেছে। ইহলোক থেকে কস্তুরী বিদায় নিল কেন, কোনওদিনই কেউ তা জানতে পারবে না। জানতেও পারবে না যে আমিও হাজির ছিলাম, থেকেও দরজার বাধা পেরিয়ে পৌঁছোতে পারিনি বুরুজের চুড়োয়। উইন্ডস্ক্রিনের ওপর নিজের ছায়া দেখে মনে মনে এতটুকু হয়ে গেলাম আমি। নিদারুণ ধিক্কারে ভরে উঠল সমস্ত অন্তর। এর চাইতে মরে যাওয়াও ভালো। বেঁচে থাকাটাও এখন নরক বাসের সামিল।

উন্মাদের মতো অনেকক্ষণ ড্রাইভ করেছিলাম সেদিন। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসতে সচমকে দেখলাম সোদপুরের মধ্য দিয়ে ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে গাড়ি। ফাঁড়িতে গেলে হয় না? লোকজন জড়ো করা উচিত নয় কি? না। আইনের চোখে কোনও অপরাধ করিনি। উলটে সবাই ভাববে কাপুরুষ... দুর্লভ সামন্ত কাপুরুষ! উঁচুতে ওঠার মতো পৌরুষ তার নেই।

সন্ধে ছ-টার সময়ে শ্যামবাজার পেরিয়ে কলকাতায় ঢুকলাম। মহেন্দ্রকে সব বলতে হবে। বলতেই হবে, পালিয়ে গেলে চলবে না।

একটা বারে ঢুকে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে চুল আঁচড়ে নিলাম। তারপর কাউন্টারের সামনে গিয়ে তুললাম রিসিভার। মহেন্দ্র কৌশিক এখন অফিসে নেই— বাইরে গেছেন। আজ আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। টেবিলে বসে এক গেলাস ব্র্যান্ডি ঢেলে দিলাম গলায়। ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো মেয়েটিকে ইহজগতে আটকে রাখার জন্যে আরও বেশি মানোবলের দরকার ছিল আমার। তা যখন নেই, তখন...

আর এক গেলাস চাই। একবার তাকে জীবন দিয়েছিলাম। কিন্তু কই, সে জীবন তো ধরে রাখতে পারলাম না? আমার জন্যেই সে...

ব্র্যান্ডির দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ে ওঠার মতো ক্লান্তি নেমেছে সারা অঙ্গে। স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিয়েই মনটা কীরকম হয়ে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই হুইলেই হাত দিয়েছিল সে। প্রেততত্ত্ববিদদের মতো যদি রুমাল বা খাম বা যে কোনও জিনিস ছুঁয়েই অনেক কিছু জানা যেত! কস্তুরীর জীবনদীপ নিবে যাওয়ার ঠিক আগের যন্ত্রণাময় মনটিকে জানার জন্য সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত আমি। না, না, এ কী ভাবছি? কোনও যন্ত্রণাই পায়নি কস্তুরী। জীবনের প্রতি নির্লিপ্ততাই তার একমাত্র গোপন রহস্য। তাই তো এ জীবনকে পুরোনো খোলসের মতোই ছেড়ে গেল সে। মাথা নীচের দিকে করে হাত দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়েছিল ও— আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছিল সেই ধরিত্রীকেই যে নির্মমভাবে ক্ষণপরেই প্রাণহীন করে দিয়েছিল তার দেহবল্লরীকে। মনে হয় যেন, ও পালায়নি... অন্য কোথাও গেছে... স্বগৃহে যাওয়ার মতোই...

এতটা ব্র্যান্ডি খাওয়া ঠিক হয়নি। একই চিন্তা বনবন করছে মাথার কোষে কোষে। এসে গেছে মহেন্দ্রর বাড়ি। ওই তো কালো গাড়িটা। ঠিক পেছনেই পার্ক করলাম। লাল মখমলের কার্পেট মোড়া সাদা মার্বেলের সিঁড়ি পেরিয়ে গটগট করে উঠে গেলাম ওপরে। তামার নেম প্লেটে ঝকমক করছে মহেন্দ্র কৌশিকের নাম। কলিংবেলের বোতাম টিপে দিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

কস্তুরীর বাড়ি। বড় বড় কয়েকটা অয়েল পেন্টিং ঝুলছিল দেওয়ালে। অদ্ভুত ছবি। মানে বোঝা ভার। উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম একটার নীচে। এককোণে নাম লেখা— কস্তুরী। ওগুলো কী? জানোয়ারের ছবি? কোন দেশের জন্তু এরা? আরেক জগতে কস্তুরীকে আহ্বান করে নিয়ে গেল কি এরাই? কোথায় দেখেছে কস্তুরী অত বড় কালো লেক? জলপদ্ম? দানবিক গাছের বুকে কালো কেউটের মতো লতার রাজত্ব? আর একটা ছবিতে একজন তরুণী মহিলার কণ্ঠে ঝুলছে একটা মণিহার। উমা দেবী। খোঁপাটা ঠিক কস্তুরীর মতো। মুখটা যেন আত্যন্তিক যন্ত্রণায় ঈষৎ বিকৃত— পলকহীন চোখে তাকিয়েছিলাম ছবিটার পানে— এমনি সময়ে খুলে গেল পেছনের দরজা।

'এসেছ!' মহেন্দ্রর গলা।

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম।

‘এসেছেন উনি?’

‘কে?... সে তো তুমিই জানো?’

ধপ করে বসে পড়লাম একটা ইজিচেয়ারে। উদ্‌ভ্রান্ত মনকে মুখে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোনও অভিনয়ই করতে হল না।

‘আজ আমরা বেরোইনি... চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। তারপরেই গেলাম ঘোষপাড়া— যদি দেখা পাই। এই আশায়। চিতপুরের সেই হোটেলেই গেছিলাম... সেখানে থেকেই আসছি আমি... এখানেও যদি না থাকে...’

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল মহেন্দ্র। ঠেলে বেরিয়ে এল চোখ দুটো। হাঁ হয়ে গেল মুখটা।

‘না, না... দুর্লভ...’ তোতলাতে থাকে মহেন্দ্র, ‘তুমি মিথ্যা বলছ... তুমি... তুমি...’

গালে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললাম, ‘বিশ্বাস করো। কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি আমি।’

‘অসম্ভব... বুঝতে পারছ না...’

কার্পেটের ওপর সজোরে লাথি মেরে দুই হাত কচলাতে কচলাতে ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ল মহেন্দ্র।

খাবি খেতে খেতে বলল, ‘খুঁজে বার করতেই হবে... এক্ষুনি— যে ভাবেই হোক... বার করতেই হবে... আমি... আমি...’

‘স্ত্রীলোক যদি পালিয়ে যেতেই চায়, তখন তাকে বাধা না দেওয়াই ভালো।’

‘পালিয়ে যেতে চায়? পালিয়ে যেতে চায়? কস্তুরী যেন পালিয়ে যাওয়ার মেয়ে!... এতক্ষণে হয়তো সে...’

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল মহেন্দ্র। ধাক্কা লেগে উলটে গেল কাশ্মীরি আতরদান বসানো একটা ছোট্ট টেবিল।

‘কী করি বলো তো, কী করা উচিত এখন? তুমি তো জানো এ অবস্থায় পড়লে কী করা দরকার? চুপ করে থেকো না, দোহাই তোমার, উত্তর দাও।’

‘সবাই হাসবে। দু-তিনদিন পরেও ফিরে না এলে অবশ্য আলাদা কথা।’

‘কিন্তু তুমি বললে হাসবে না। তুমি উকিল মানুষ... তা ছাড়া তুমি যদি বুঝিয়ে বলো সবাইকে যে আরও একবার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল কস্তুরী। সেবার গঙ্গা থেকে

ওকে তুলে না আনলে কী যে হত... আজও হয়তো সেই চেষ্টাই করেছে ও... তুমি বললে বিশ্বাস করবে সবাই... নিশ্চয় করবে...'

'কিস্যু করার দরকার নেই। এই তো ক-ঘণ্টা হল বাইরে গিয়েছেন উনি। রাত্রে খাবার আগেই আবার ফিরে আসবেন-খন, এ নিয়ে এত চিন্তার কী দরকার?'

'যদি না আসে?'

'না এলেও তার অন্তর্ধানের বৃত্তান্ত রিপোর্ট করাটা তো আমার ব্যাবসা নয়।'

'অর্থাৎ তুমি সরে দাঁড়াচ্ছ?'

'ঠিক তা নয়... একটু বুঝতে চেষ্টা করো... পুলিশে স্বামীই খবর দেবে— এইটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'বেশ এখুনি দিচ্ছি।'

'মিছে লোক হাসাবে। ক-ঘণ্টা হল তোমার স্ত্রী বাড়ি ফেরেননি। তোমার এই কেস শুনে আর সামান্য এই প্রমাণ নিয়ে তারা কোনও অ্যাকশনই নেবে না। যা বলবে তা-ই লিখে নিয়ে সাফ বলে দেবে, পাওয়া গেলেই খবর দেওয়া হবে। এর বেশি আর কিছুই করবে না।'

আলগোছে বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করে রাখল মহেন্দ্র।

'কিন্তু এইভাবে যদি নিষ্কর্মা হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয় আমাকে, তাহলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।'

আবার পায়চারি শুরু করল মহেন্দ্র। তারপর জানলার সামনে পেতলের ঝকমকে টবে রাখা একগুচ্ছ গোলাপের পানে তাকিয়ে রইল বিষণ্ণ চোখে।

'এবার তো আমাকে উঠতে হয়।' বললাম আমি।

একটুও নড়ল না মহেন্দ্র। নির্নিমেষে চোখে তাকিয়ে রইল গোলাপগুচ্ছের পানে। সামান্য একটা কাঁপন চকিতে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল মুখের রেখায় রেখায়।

দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, 'ফিরে এলে আমাকে ফোনে খবরটা দিও।'

আর নয়, এইবার যাওয়ার সময় হয়েছে। নিজের চোখের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলাম না। নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না মুখের মাংসপেশিগুলোকে। মুখ-বন্ধ আগ্নেয়গিরির মতোই নিষ্ঠুর সত্য ফুঁসে উঠে আসতে চাইছে ওপরে।

চৌকাঠে পা দিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। দুই করতলে মাথা গুঁজে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল মহেন্দ্র। আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে এলাম। সবচেয়ে কঠিন অংশটুকু ভালোভাবেই শেষ করা গেছে। যবনিকা পড়েছে মহেন্দ্রর কেসে। এবার ওর মানসিক যন্ত্রণা... কিন্তু আমার যাতনা কি তার চাইতেও বেশি নয়? অনেক বেশি! গাড়িতে বসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। প্রথম থেকেই কস্তুরীর প্রকৃত স্বামীরূপে নিজেকে কল্পনা করে এসেছি— সুতরাং আমার মনোবেদনা তো বেশি হবেই। মহেন্দ্র তো এতদিন জবরদখল করেছিল কস্তুরীকে। কাজে কাজেই এ-হেন নীচ ব্যক্তির জন্যে নিজেকে কি কেউ উৎসর্গ করে? না, পুলিশে গিয়ে বলে যে, একদিন আমরা সহপাঠী ছিলাম, বন্ধুর তরুণী ভার্যার আত্মহত্যার সময়ে হাজির ছিলাম অকুস্থলে— কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করার সাহস আমার ছিল না...! এখন কোথাও চলে গেলেই ভালো ছিল। বাঁকুড়ার সেই মক্কেলের কেসটি নিলে কলকাতা ছেড়ে কিছুদিন দূরে সরে যাওয়া যায়।

কীভাবে গাড়ি চালিয়ে গ্যারেজে গাড়ি তুলেছিলাম সেদিন, তা জানি না। হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, পা টেনে টেনে হাঁটছি আমি। ব্ল্যাক আউটের রাস্তা। ঠুলিপরা ল্যাম্পপোস্ট; তারার আলোর মতো ফ্যাকাশে আলো। বেশি রাত হলেই রাস্তাগুলো আজকাল আরও জনহীন হয়ে যাচ্ছে। সকাল সকাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানগুলো। খাঁ-খাঁ করছে মোড়গুলো। মাঝে মাঝে দেখা যায় সামরিক যানের যাতায়াত। যুদ্ধের আতঙ্কে সত্যি সত্যিই মুষড়ে পড়েছে শহরের আত্মা। আর, সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে বারবার আমার মনকে ঠেলে ঘুরিয়ে দিচ্ছে মৃত কস্তুরীর চিন্তায়। সামনেই একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়লাম।

'ওমলেট আর টোস্ট।'

কিছু খাওয়া দরকার। দু-দিন আগেকার স্বাভাবিক জীবনে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। খিদে না পেলেও খেতে হবে। পকেটে হাত দিতেই আয়নাটা আঙুলে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা টেবিল ক্লথ আর চোখের মাঝে যেন ভেসে উঠল সেই মুখ... কস্তুরীর মুখ।

কলের পুতুলের মতো চামচ দিয়ে ওমলেটটা কেটে কেটে মুখে পুরতে লাগলাম। বৈরাগীর মতো নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছি ইহসংসারের সবকিছুর প্রতি। এখন থেকে কপর্দকহীনের মতো জীবনযাপন করব— শোকসাগরে নিমজ্জিত থাকব প্রতিটি মুহূর্ত; প্রায়শ্চিত্ত করব আমৃত্যু— এ ছাড়া আর পথ নেই। ঘৃণার আগুনে তিল তিল করে পুড়িয়ে

মারতে হবে নিজেকে— যতদিন না আত্মসম্মানের নতুন কোনও অধ্যায় উন্মোচিত হচ্ছে অন্ধকার জীবনে।

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আরও অন্ধকার হয়ে এসেছে শহর। বড় বড় বাড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ তারার রোশনাই। মাঝে মাঝে সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা মোটর, মিলিটারি সাঁজোয়া গাড়ি— হেড লাইটগুলোকেই ঠুলি পরিয়ে রেখেছে বোমার ভয়ে। মন স্থির করে উঠতে পারলাম না বাড়ি যাব কি না। ভয় টেলিফোন যন্ত্রটাকে— ঝনঝন করে বেজে উঠে নিয়ে আসবে সেই ভয়ংকর সংবাদ— লাশ পাওয়া গেছে! তা ছাড়া যে-দেহের অক্ষমতার জন্যে কস্তুরীর প্রাণবিয়োগ ঘটল, সে দেহকে ক্লান্তিদেহে আরও কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে চাই। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে ক্ষিপ্তের মতো এলোমেলোভাবে এদিকে-ওদিকে করলাম কিছুক্ষণ। ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই নির্যাতিত হোক অপটু দেহ। কস্তুরী! কস্তুরী! হতভাগিনী কস্তুরী!

অশ্রু এবার আর বাধা মানল না। উপচে উঠে গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। জলের ধারা মুছলাম না। কাঁদলে মনটা অনেকটা লঘু হয়ে যায়। বুকের অসহ্য অবর্ণনীয় টনটনে ব্যথাটা একটু যেন ফিকে হয়ে আসে। জমাট বাঁধা বেদনাটাই যেন গলে গলে অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসছে। আসুক। সামনে ও কীসের জল? গঙ্গা। ওই বেঞ্চিটায় একটু বসা যাক। বড় ঠান্ডা পড়েছে।

তাতে কী? মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখ জুড়ে আসছে। ওই সেই গঙ্গা... যেখানে কস্তুরী... আয়না...

ভোরবেলা হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলাম। ডান পায়ের শিরা টেনে ধরছে দারুণ ঠান্ডায়। রাস্তায় নেমে এসে এক ভাঁড় চা খেয়ে রওনা হলাম বাড়ির দিকে।

দরজা বন্ধ করতে না-করতেই বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। 'হ্যালো! কে, দুর্লভ?'

'হ্যাঁ।'

'যা ভয় করেছিলাম, কস্তুরী আত্মহত্যা করেছে।'

কিছু না বলাই ভালো। প্রায় দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'কালকেই খবর পেলাম। একটা বুরুজের নীচে ওর লাশ দেখতে পেয়েছে একজন বুড়ি।'

'বুরুজ? কোথায়?'

'শ্যামনগরের কাছে ভাঙা নীলকুঠির বুরুজ...'

'ওখানে কী করতে গেছিলেন উনি?'

'বুরুজের চুড়ো থেকে নীচের উঠোনে লাফিয়ে পড়েছিল কস্তুরী। ডেডবডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কী শোচনীয় মৃত্যু! তুমি যাচ্ছ নাকি?'

'এইমাত্র ফিরলাম আমি। খবর পেয়েই ছুটেছিলাম। তোমাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম — কিন্তু বাড়িতে ছিলে না তুমি। কিছু জরুরি কাজ ছিল বলে কলকাতায় এসেছি— এখুনি আবার ফিরে যাচ্ছি। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

'তা তো করবেই। যদিও এ মৃত্যু সুইসাইড ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'কয়েকটা গোলমেলে ব্যাপার দেখে মাথা গুলিয়ে গেছে পুলিশের। যেমন ধরো, সুইসাইডই যদি করতে হয়, এতদূরে আসার দরকারটা কী! কী যে ছাই বলি আমি, বুঝতে পারছি না। ওদেরকে এ-কথাটাও আমি জানাতে চাই না যে কস্তুরী...'

'অতদূর ওরা এগবেই না।'

'যাই হোক, আমার সঙ্গে তুমি থাকলে স্বস্তি পেতাম।'

'যাওয়ার তো এখন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা একটা জরুরি মোকদ্দমার ব্যাপারে বাঁকুড়া যেতে হচ্ছে আমাকে।'

'অনেকদিন লাগবে নাকি?'

'না, না, দিনদুয়েকের ব্যাপার। তা ছাড়া আমাকে তোমার দরকারই হবে না।'

'আবার ফোন করব-খন।' জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল মহেন্দ্র— ঠিক যেন হাঁপাচ্ছে।

লাইন কেটে দিলাম। দেওয়ালের ধরে টলতে টলতে বিছানার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়লাম চিত হয়ে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।

একটু পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ক্ষতবিক্ষত চেতনা।

সেই দিনই বাঁকুড়ার রওনা হয়েছিলাম। ছুটন্ত ট্রেনের তালে তালে মন ছুটে গেছিল শ্যামনগরের নীলকুঠির সেই প্রাঙ্গণে। উঁচু বুরুজের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ— তার ওপরে পড়ে একটি রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড... পুলিশ নিশ্চয় পোস্টমর্টেম করে আরও কদাকার ভয়াবহ

করে তুলেছে সেই অপরূপ তন্বী দেহটিকে। কতদূর এগল তদন্ত? যুদ্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে আসল রহস্যের সন্ধান কি পাওয়া যাবে?

বাঁকুড়ার হোটেলে আস্তানা নিয়েছিলাম। পরের দিন কাগজ খুলে খুঁজেছিলাম খবরটা। ভেতরের পৃষ্ঠায় এককোণায় বেরিয়েছিল মাত্র ক-টি লাইন। বড় বড় যুদ্ধের ছবি আর খবরের ভিড়ে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল লাইন ক-টি। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। তাদের সন্দেহ এ মৃত্যু আত্মহত্যা নয়। মহেন্দ্র নিশ্চয় নাজেহাল হচ্ছে পুলিশের জেরার সামনে। আর ক-টা দিন। তারপরেই ফিরে গিয়ে ভেবে দেখব। পুলিশের সামনে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে মহেন্দ্রকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করব কি না, তা ভেবে দেখব কলকাতায় ফেরার পর।

কিন্তু সে সুযোগ আর এল না। দু-দিন পরেই জাপানিরা বোমা ফেলল কলকাতায়। কীরকম যেন হয়ে গেলাম। কলকাতায় ফিরে এসে সামান্য ক-টি সুটকেস নিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে আবার পা বাড়ালাম কলকাতার বাইরে। ঘুণাক্ষরেও তখন জানতে পারিনি, প্রবাসেই অতিবাহিত হবে এতগুলি বছর। ঘটনার পাকেচক্রে এমন জড়িয়ে পড়লাম যে দীর্ঘ চারটি বছর হারিয়ে গেল কালের গর্ভে— কলকাতায় ফেরার কোনও সুযোগই পেলাম না।...

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

'. াস নিন... জোরে... কাশুন... আর একবার শ্বাস নিন... ফাইন... এবার হার্টটা দেখা যাক... নিঃশ্বাস ধরে রাখুন, ছাড়বেন না... হুম! খুব ভালো দেখছি না... ঠিক আছে, জামা-কাপড় পরে নিন...'

ডাক্তারের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে থেকে চোরের মতো সরে গিয়ে শার্টটা গায়ে চাপালাম আমি।

'বিয়ে করেছেন?'

'না... এই তো ফিরলাম বোম্বে থেকে।'

'কী করতেন সেখানে?'

'অনেকরকম কাজ। কিছুদিন সেলসম্যান ছিলাম একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে। ভালো লাগল না সে কাজ... তাই...'

'এবার কি কলকাতাতেই থাকবেন?'

'ঠিক জানি না। আগে এখানেই প্র্যাকটিস করতাম। কিন্তু এখন যে কী করব, তা-ই জানি না।'

'কীসের প্র্যাকটিস?'

'আইনের।'

'তাহলে থেকে যান। প্র্যাকটিস জমতে কতদিনই বা যাবে।'

'একটা ফ্ল্যাট তো দরকার। আগের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটা পাঞ্জাবি ফ্যামিলি রয়েছে। জানেন তো এখন বাসা পাওয়া কী মুশকিল।'

কান চুলকোতে চুলকোতে ডাক্তারবাবু শুধোলেন, 'আপনি মদ খান?'

'তা খাই। জীবনে অনেক চোট খেয়েছি তো।'

টেবিলে বসে পড়ে ফাউন্টেন পেনের ক্যাপ খুলতে খুলতে বললেন ডাক্তার, 'আপনার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো দেখছি না। প্রচুর বিশ্রাম দরকার আপনার। সমুদ্রতীরে মাসখানেক থাকতে পারলে খুবই ভালো হয়... আর আবোলতাবোল চিন্তা আর স্বপ্ন সম্বন্ধে যা বললেন — সে ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নেই। আমি লিখে দিচ্ছি— আপনি ডক্টর মল্লিকের সঙ্গে দেখা করুন— এ বিষয়ে উনি স্পেশালিস্ট।'

'যা বললেন, তা কি সত্যিই খুব সিরিয়াস।' ভয়ে ভয়ে শুধোই।

'ডক্টর মল্লিকের সঙ্গে দেখা করুন।'

খসখস করে প্যাডের ওপর কলম চালালেন ডাক্তার।

'আপনার এখন দরকার ভালো খাওয়া, পুরো বিশ্রাম, আর উদ্ভট চিন্তা থেকে মাথাকে একদম রেহাই দেওয়া। চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ রাখুন। পড়াশুনাও তা-ই।... আট টাকা... থ্যাংক ইউ।'

বিড়বিড় করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। স্পেশালিস্ট! সাইকিয়াট্রিস্ট! সব রহস্য জেনে নিয়ে কস্তুরীর মৃত্যু সম্বন্ধেও কথা বলতে বাধ্য করবে আমাকে। পাগল আর কি! তার চাইতে বরং সারা জীবন এই দুঃস্বপ্ন নিয়েই থাকব। তবুও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে মনের দরজা খুলতে যাব না। বোম্বাইতে এই ক-টা বছর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি। শরীর ভেঙেছে সেই কারণেই। এখন আর কোনও ভয় নেই।

কলকাতাকে যেন আর চেনাই যায় না। অনেক পালটেছে এই ক-বছরের মধ্যে। ম্যাডান স্ট্রিটের বারে ঢুকে একটা নিরালা টেবিলে বসে পড়লাম।

পর পর দু-পেগ ব্র্যান্ডি গলা দিয়ে নামিয়ে একটু ধাতস্থ মনে হল নিজেকে। আরও এক গেলাস রেখে গেছে সামনে। টলটলে হলুদ সুরা। মনের আঁধারে সুপ্ত প্রেতদের যে জাগিয়ে তুলতে অদ্বিতীয়। না, কস্তুরী মরেনি। প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়ার পর থেকেই কস্তুরী সঙ্গ নিয়েছে আমার। অনেক মুখই মানুষ ভুলে যায়। পাথরে খোদাই মূর্তিও রোদে জলে ক্ষয়ে যায়। কিন্তু কস্তুরীর মুখ কোনওদিন ভোলা যাবে না। প্রাণচঞ্চল স্ফুর্তিতে উজ্জ্বল অপরূপ রূপসী তন্বী দেহকে আবার চোখের সামনে দেখতে পেলাম... ছলছল করে জল বয়ে চলেছে গঙ্গায়... ঝুঁকে পড়েছে কস্তুরী... টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল চিঠিটা...

এক ঢোকে নিঃশেষ করে দিলাম গেলাসটা।

‘ওয়েটার! আর একটা।’

মদ আমার ভালো লাগে না, কিন্তু মদ ছাড়া ইদানীং থাকাও যাচ্ছে না। কলকাতায় নেমেই মহেন্দ্রর খোঁজ নিয়েছিলাম। মহেন্দ্র মারা গেছে মোটর দুর্ঘটনায়। কস্তুরীর মৃত্যুর কিছু পরেই। দূর সম্পর্কের এক ভাই আস্তানা নিয়েছে তার প্রাসাদ তুল্য ভবনে। কিন্তু তবুও স্বস্তি পাচ্ছি কই? তুষের আগুনের মতো সেই জ্বলুনিটা...

কপাল ভালো। বাইরে পা দিয়েই ট্যাক্সিটা পাওয়া গেল। অনেক দূরে যাব। হ্যাঁ, শ্যামনগর। সেই টাওয়ার... সেই চত্বর... সেই ভাঙা নীলকুঠি... যেন চুম্বকের মতো টানছে আমাকে...

হলুদ রঙের ধূ-ধূ সরষের খেতের অপরূপ সুষমা, পথের দু-ধারে অজস্র হাড়মটমটি গাছের লাইলাক রঙের ফুলের বন্য সৌন্দর্যেও দৃষ্টি ছিল না আমার। পুরোনো সেই চত্বরটার সামনে এসে হঠাৎ বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ওই তো বুরুজ। বুরুজের ওপর থেকে যে কুঁড়ে ঘরগুলো লক্ষ করেছিলাম, তারই একটার দিকে এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে। স্নায়ুগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। নার্ভাসনেস।

মুদির দোকান। আধবুড়ো মুদি আমাকে দেখে একটু অবাকই হল।

‘কী দেব বলুন?’

আমতা আমতা করে বলি, ‘এসেছিলাম বুরুজটা দেখতে। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিট গল্প করে যাই।’

গাঁয়ের মানুষ শহরের বাবুর মুখে আপনি সম্বোধন শুনে খুশিই হল। খাতির করে নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসিয়ে তক্ষুনি এক ভাঁড় চায়ের অর্ডারও দিয়ে দিল। একথা-সেকথার পর শুধোলাম, ‘আচ্ছা, কয়েক বছর আগে কাগজে পড়েছিলাম কে যেন আত্মহত্যা করেছিল এখানে?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি মেয়ে বুরুজ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল।’

‘মনে পড়েছে— কলকাতার একজন মস্ত ব্যবসাদারের বউ। তা-ই না?’

‘হ্যাঁ, নামটা মনে নেই। লাশটা বুড়ির চোখে পড়ার পর আমিই পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। তার ঝক্কিও কম পোয়াতে হয়নি। তবে কেউ কেউ বলে মেয়েটাকে নাকি ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।’

‘ঠেলে দেওয়া হয়েছে?’ মাথা ঘুরে ওঠে আমার।

‘হ্যাঁ, একজন বুড়ো একটা গাড়ি যেতে দেখেছিল। গাড়িতে ছিল একজন মেয়েলোক, আর একজন ভদ্দরলোক।’

রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করলাম। কস্তুরী আর আমাকেই যেতে দেখেছে বুড়ো, অর্থাৎ খুনি হিসাবে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্যে একজন সাক্ষী অন্তত হাজির রয়েছে এ গ্রামে। অবশ্য সে বুড়ো এখন বেঁচে আছে কি না ভগবান জানেন। তবুও সাবধানের মার নেই। এ জায়গা ছেড়ে এবার সরে পড়াই ভালো।

আরও দু-চার কথার পর উঠে পড়লাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে উত্তেজনায়। ব্র্যান্ডির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

ট্যাক্সি ফিরে এল কলকাতায়।

মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেও ডক্টর মল্লিকের কাছে না গিয়ে পারলাম না। সব কথাই খুলে বললাম— কিছু কিছু অবশ্য বাদ দিয়ে। মহেন্দ্রর নাম একেবারেই উল্লেখ করলাম না; পুলিশের সন্দেহের কথাও চেপে গেলাম। বলতে বলতে বার কয়েক ঝরঝর করে কেঁদেও ফেললাম।

শুনে সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, ‘তাহলে এখনও আপনি ভদ্রমহিলাকে দেখার আশা রাখছেন। আপনি বিশ্বাস করেন না যে, তিনি মৃত?’

‘বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, ডক্টর। এ যে আমি নিজের কানে শুনেছি, স্বচক্ষে দেখেছি।’

‘যা-ই দেখে থাকুন অথবা শুনে থাকুন না কেন, সারকথা এই— আপনি বিশ্বাস করেন কস্তুরী বেঁচে থাকতে পারে এই কারণে যে, মৃত্যুর পরেও তাঁকে একবার বেঁচে উঠতে দেখা গেছে।’

‘ঠিক ওইভাবে অবশ্য আমি বলতে—’

‘অন্য কিছুভাবেও বলেননি আপনি। পক্ষান্তরে, নিজের অজ্ঞাতসারে এমন সব কথা বলছেন, যাতে সমস্ত জিনিসটাই বেশ ঘুলিয়ে ওঠে। নিন, ওই কৌচটায় শুয়ে পড়ুন দিকি।’

বেশ কিছুক্ষণ ধরে রিফ্লেক্স পরীক্ষা করলেন ডক্টর। তারপর কপাল কুঁচকে বললেন, ‘আগে মদ খেতেন?’

‘খুব বেশি নয়; নেশা ছিল না— এখন নেশায় দাঁড়িয়েছে।’

‘আর কোনও মাদক দ্রব্য?’

‘না।’

'সত্যি সত্যিই সেরে উঠতে চান কি না ভাবছি আমি।'

'সেই জন্যেই তো এলাম আপনার কাছে।'

'তা যদি চান তো মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে; মন থেকে এই মেয়েটিকে নির্বাসন দিতে হবে। মনকে এই কথাই বিশ্বাস করাতে হবে যে, সে মরে গেছে— একেবারেই মরেছে— আর বেঁচে উঠবে না। বুঝেছেন তো— স্থায়ী মৃত্যু... কিন্তু তার আগে আর একবার জিজ্ঞেস করে নিই, সত্যি সত্যিই সেরে উঠতে চান কি না বলুন।'

'কী বলছেন ডক্টর? কী করে যে বিশ্বাস করাই আপনাকে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে শুরু হল আপনার চিকিৎসা। পুরীতে আমার বন্ধুর বাড়ি আছে... সমুদ্রের ধারেই স্বর্গদ্বারে— চিঠি দিচ্ছি আপনাকে।'

ঢোক গিলে বলি, 'তাহলে পাগলা গারদে থাকার দরকার নেই?'

হেসে উঠলেন ডক্টর।

'না, না, সেরকম সিরিয়াস কিছু হয়নি। পুরীতে যেতে বলছি কেবল সেখানকাব জল-হাওয়ার জন্য। কাছে টাকা আছে তো?'

'আছে।'

'আগে থেকেই জানিয়ে রাখি, এ চিকিৎসা দু-দিনে শেষ হবে না।'

'যত দিন লাগুক, আমি রাজি আছি।'

পা টনটন করছিল, তাই বসে পড়লাম সামনের চেয়ারে। ডাক্তারের কোনও কথায় আর কান ছিল না; একই কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার আবৃত্তি করে চলেছিলাম মনে মনে, আমি সেরে উঠতে চাই... সেরে উঠতে চাই...

চিকিৎসার শুরু থেকেই একটু একটু করে অনুশোচনা দানা বেঁধে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। এ অনুশোচনা কস্তুরীকে ভালোবাসার... ভালো না বাসলে তো এভাবে কষ্ট পেতে হত না আমাকে। আবার নতুন করে শুরু হোক আমার জীবনযাপন, নতুন উদ্যম নিয়ে। অস্পষ্ট হয়ে যাক পুরোনো পৃষ্ঠাগুলো— তাহলেই আবার ভালোবাসতে পারব আর কাউকে... আর সবার মতোই সুখে ঘর বাঁধতে পারব। তখনও উপদেশবর্ষণ করে চলেছিলেন ডক্টর। সব কিছুতেই সায় দিয়ে চলেছিলাম, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলাম সব নির্দেশেই। হ্যাঁ, আগামী কালই রওনা হব পুরীতে। মদ খাওয়াও বন্ধ করব। পুরো বিশ্রাম নেব। রাজি... রাজি... রাজি— সমস্ততে রাজি...

'ট্যাক্সি ডেকে দেব? ডক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

'না; একটু হাঁটলে মনটা ভালো থাকবে।'

প্রথমেই বুকিং অফিসে গিয়ে আগামী কালের টিকিট কাটলাম। তারপর ব্যাঙ্ক আর হোটেল। হাতে এখনও অনেকটা সময় রয়েছে। সিনেমায় ঢুকে পড়লাম— ছবি দেখার চাইতে সময় কাটানোই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। আরও উদ্দেশ্য আছে— ডক্টর মল্লিকের প্রশ্নগুলোকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমি। কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও কি ভেবেছি, পাগল হতে হবে আমাকে? তাই দারুণ ভয় সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরেছিল মনটাকে। স্নায়ুগুলোও তখন থেকে স্থির নেই। হাত-পা সবই যেন কাঁপছে। একটু ব্র্যান্ডি পেলে ভালো হত। পরক্ষণেই দাঁতে দাঁত পিষে গালি দিয়ে উঠলাম নিজের দুর্বলতাকে।

আলোকিত হয়ে উঠল রুপোলি পর্দা। প্রথমেই খবর— কটকের দৃশ্য: জনতার ভিড় ঠেলে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে চলেছেন মঞ্চের দিকে; চরকা আঁকা পতাকা, লাল পাগড়ি আর অজস্র উৎসুক মুখ। আরও কাছে এগিয়ে এল ক্যামেরা— জনতা জয়ধ্বনি করছে, কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না; হাত নাড়ছে একজন মোটা লোক। ধীরে ধীরে ক্যামেরার লেন্সের দিকে ফিরে দাঁড়াল একজন স্ত্রীলোক... ফ্যাকাশে চোখ... কিন্তু দেহরেখা দেখে পটে আঁকা ছবির কথা মনে পড়ে যায়। এগিয়ে গেল ক্যামেরা... কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই চিনতে পেরেছিলাম... চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইলাম পর্দার পানে।

পেছনের সারি থেকে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন!'

দু-হাতে তখন নিজের গাল খামচে ধরেছি আমি— অবরুদ্ধ আর্ত-চিৎকারে ফেটে পড়তে চাইছে বুকের খাঁচাটা। শূন্য দৃষ্টি মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম পর্দার জনতার পানে, গান্ধীজীর এগিয়ে চলা মূর্তির পানে। তারপরেই একটা হ্যাঁচকা টানে বসে পড়লাম সিটে।

(২)

না, ক. রী নয়... তক্ষুনি উঠে গিয়ে পরের শো-র একটা টিকিট কিনে আনলাম। শো শেষ হয়ে যাওয়ার পর উঠে গেলাম নতুন সিটে। পরের শো-র শুরুতেই নিউজ-রিল— উত্তেজনায় ধকধক করছিল বুকটা। যে মুখ দেখার জন্যে এই প্রতীক্ষা, তাকে এবার শুধু দেখা নয়, মনের পটে মুদ্রিত করে রাখতে চেয়েছিলাম আমি। তাই ওই দু-এক সেকেন্ডের মধ্যেই যতটা সম্ভব দেখে নিয়েছিলাম। বছর তিরিশ বয়স মেয়েটির; খুব ছিপছিপে নয়। মুখটা হুবহু সেরকম নয়— তবুও বিস্ময়কর সেই সাদৃশ্য। বিশেষ করে চোখ দুটি তো অবিকল তারই মতো। মনের সমস্ত শক্তি এক করে স্মৃতিতে আঁকা মুখটির সঙ্গে পর্দায় দেখা মুখটি মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছিটিয়ে পড়া কিছু কিছু রং ছাড়া আর রইল না কিছুই— জোরালো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

পরের দিন পুরী যাওয়া বাতিল করলাম। ম্যাটিনি শো-তে গিয়ে আর একবার দেখে এলাম সেই মুখ। এবার আরও খুঁটিয়ে... দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে চোখে পড়ল তখনই। মেয়েটির ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে একজন সুবেশ পুরুষ। পরনে বিলিতি পোশাক। সুদৃশ্য পিন দিয়ে আটকানো নেকটাই। আলগোছে মেয়েটির হাত ধরেছিল সে। মেয়েটির গায়ে আলস্টার, ফারের কলার।

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল আরও অনেক কিছু। ভিড়ের ওপর দেখা যাচ্ছিল একটা মস্ত সাইনবোর্ড— হোটেল কসমোপলিটান। অস্পষ্ট

দেখা যাচ্ছিল নামটা, তবুও নজর এড়ায়নি আমার। খুব সম্ভব হোটেলে ডেরা নিয়েছিল দু-জনে— শোভাযাত্রা দেখে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল ক্যামেরার সামনে।

হাসি পেল। এক সময়ে গোয়েন্দাগিরি করেছি বলে কি এখনও এই সামান্য দৃশ্য থেকে এত কিছু ভাবতে হবে?

সামনেই বার। সামলাতে পারলাম না; একটা হুইস্কি শেষ করে আর একটার অর্ডার দিয়ে ঝিম মেরে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

ব্র্যান্ডিতে আর শানায় না। হুইস্কি অনেক ভালো— অনেক তেজালো। স্নায়ুর দুর্বলতা চকিতে মুছে দিতে অদ্বিতীয়। দুই মুখের আদল এক হতে পারে, কিন্তু তাতে কী? যা শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আবার ভাবা কেন? সুদূর কটক শহরে হুবহু তারই মতো দেখতে একটি মেয়েকে নিয়ে সুখে ঘর বেঁধেছে একজন পুরুষ— তা দেখে কেন এই অব্যক্ত বেদনায় ছটফটিয়ে মরব আমি? না, আর কোনও দ্বিধা নয়, দুর্বলতা নয়। কালই পুরী রওনা হব। সমুদ্রের হাওয়ায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও চাঙ্গা করে তুলতে হবে। চিরতরে স্তব্ধ করতে হবে এই দুঃসহ স্মৃতির রোমন্থন।

পরদিন যথাসময়ে রওনা হয়েও কিন্তু পুরী পৌঁছোন আর হল না। কটকে পৌঁছেই হঠাৎ সুটকেস নিয়ে স্টেশনে নেমে পড়লাম। মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত আর সামলাতে পারলাম না। একটা দিন কটকে থেকে গেলে ক্ষতি কী?

স্টেশন থেকে সিধে হোটেল কসমোপলিটান। ঘর একখানা আছে বটে, তবে রেট বেশি। লাগোয়া বাথরুম। কুছ পরোয়া নেহি। এরকম উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির অবস্থায় একটু বিলাসিতাই পছন্দ করছিলাম আমি।

'গান্ধীজী কবে এসেছিলেন এখানে?' কথায় কথায় হঠাৎ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করি আমি।

'তা প্রায় মাসখানেক আগে তো বটেই।'

মাসখানেক! অনেকগুলো দিন কেটে গেছে এর মধ্যে!

'স্যুটপরা মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন এখানে? টাইপিন লাগাতেন নেকটাইতে?'

নিতান্ত বোকার মতো প্রশ্ন শুনে ম্যানেজার মনে মনে হাসলেন কি না বোঝা গেল না, মুখে বললেন, 'তা তো বলা মুশকিল। ওরকম তো কত লোকই আসছে-যাচ্ছে।'

তা তো বটেই। কিন্তু কার আশায় এত দূর ছুটে এসেছি আমি? বিকৃত কল্পনাকে এভাবে প্রশ্রয় দিয়ে কোনও লাভ আছে কি? কিন্তু না। আর বিতর্ক নয়। একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক। কালকের সারাদিনটা তো রয়েছেই।

সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নিলাম। নেমে এলাম খাবার ঘরে। বেশ বড় হোটেল। বার রয়েছে একদিকে। ওপাশে রেস্তোরাঁ। ব্রেকফাস্ট সামনে নিয়ে বসে রয়েছে স্বদেশি বিদেশি কত যুগ্ম মূর্তি। আমিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি, যার সঙ্গী নেই। ওদিকের টেবিলে চোখে পড়ল একজন মোটা লোককে... স্বপ্ন দেখছি নাকি আমি?... নেকটাইতে টাইপিন...

জয় ভগবান! এই কি সেই? বছর পঞ্চাশ বয়স, পরিপাটি বেশ। সামনের চেয়ারে-বসা তরুণীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওমলেট খাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। মেয়েটি আমার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল, মুখ দেখা যাচ্ছিল না। একমাথা কুচকুচে কালো চুল। আলস্টারের ফার কলারে ঢাকা পড়ে গেছে খোঁপার খানিকটা। মুখ দেখতে হলে হলের ওদিকে যেতে হবে... যাব। একটু পরেই যাব। এই মুহূর্তে আবার অসংযত হয়ে উঠেছে স্নায়ুগুলো। আঙুল কাঁপছে। কাঁপা আঙুলেই একটা সিগারেট তুলে নিয়ে পরক্ষণেই যথাস্থানে রেখে দিলাম। ব্রেকফাস্টের আগে সিগারেট খাব না।

চেষ্টা করে স্বাভাবিক গলায় কাউন্টারের ওয়েটারকে শুধোলাম, 'ওই যে ভদ্রলোক... মাথার সামনের দিকে টাক পড়েছে... সামনে বসে ওই যে আলস্টার গায়ে ভদ্রমহিলা... ওঁদের নাম কী?'

'ভদ্রলোকের নাম নিশিকান্ত শর্মা।'

'নিশিকান্ত শর্মা!... কী করেন?'

'কী করেন না বলুন? চাকরি বাদে এমন কিছু নেই যা করেন না। টাকার কুমির।'

'উনি ওঁর স্ত্রী?'

'উঁহু, কোনও মেয়েকেই বেশিদিন সহ্য করতে পারেন না উনি।'

'বটে। টাইম টেবলটা আছে নাকি?... ঠিক আছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টাইম টেবলের পাতা ওলটাতে লাগলাম। কিন্তু চোখ রইল সামনে। মেয়েটি সামান্য ঘুরে বসেছে। আরও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে মুখশ্রী। আচম্বিতে লাফিয়ে ওঠে হৃদযন্ত্রটা। কস্তুরী! মনকে যে আর চোখ ঠাউরানো যাচ্ছে না। অনেক পালটে গেছে ও। আগের চাইতে মুখটা একটু ভারী হয়েছে। মুখের সে কাঁচা ভাবটিও আর তেমন নেই। এ আর এক কস্তুরী... কিন্তু সেই কস্তুরীই বটে... হুবহু এক!

আস্তে আস্তে চেয়ারে এলিয়ে পড়ি আমি। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘামটুকু মুছে নেওয়ার শক্তিও যেন নেই আমার। হঠাৎ প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে চিন্তাধারাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু আর ভাবতে পারছি না। চোখ বুজেও কস্তুরীর মূর্তিকে মুছে ফেলতে পারিনি মস্তিষ্কের প্রতিটি বেদনাময় কোষ থেকে।

'কস্তুরী! কস্তুরী! কস্তুরী!' ঠক করে হাত থেকে টাইম টেবলটা পড়ে গেল মেঝের ওপর।

অনেক চেষ্টায় অনেকক্ষণ পরে সামলে নিলাম নিজেকে। ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। না, কস্তুরীর মতো নয়— তবুও কস্তুরীই বটে। কিন্তু এটা নিশ্চিত হচ্ছি কী কারণে। সামনেই সুবেশ পুরুষটির সামনে ওই যে সুন্দরী, সে যে কস্তুরীই— সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। স্বপ্ন নয়, সত্য। আমি যেমন স্বপ্ন নয়, সামনের ওই রহস্যময়ী নারীটিও তেমনি স্বপ্ন নয়। এ কী নিষ্ঠুর সত্য! সত্য কি এত বেদনাদায়ক হয়? ওই সত্যকে মেনে নিই কী করে? নিজের চোখে দেখেছি যে তাকে মরতে?

কস্তুরী মৃতা। কিন্তু কস্তুরী জীবিতা। ওই সেই কস্তুরী।

মেয়েটির হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে নিশিকান্ত শর্মা। এগিয়ে আসছে এই দিকেই। চট করে টাইম টেবল তুলে ধরে মুখ আড়াল করলাম। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে চোখে পড়ল শুধু মূল্যবান ট্রাউজারের নীচে একজোড়া ঝকমকে স্যু, আর নীল শাড়ির তলায় একজোড়া সাদা চপ্পল।

লিফট-এর দরজা বন্ধ হয়ে ওপরে উঠে যেতেই টাইম টেবল রেখে উঠে দাঁড়ালাম। বুকটা আবার টনটন করছে। পুরোনো ক্ষতের বেদনা। অনেকদিন আগেকার ভালোবাসা অসহ্য যাতনা নিয়ে আবার জেগে উঠছে। মেয়েটি কি আমাকে দেখেছে?

'আজ যাচ্ছেন নাকি?' শুধোয় কাউন্টারের ক্লার্ক।

'না, না, বলতে পারছি না কবে যাব।'

সারাটা সকাল হুইস্কি খেয়ে রোদে রোদে ঘুরে বেড়ালাম। লাশটা শুধু আমি একাই দেখিনি— দেখেছে মহেন্দ্র, দেখেছে বুড়ি— আরও অনেকে। পুলিশও নিশ্চয় আহাম্মকের মতো তদন্ত করেনি, অন্ততপক্ষে জনদশেক লোক সাক্ষী দিতে পারে যে কস্তুরী মৃতা। তা-ই যদি হয়, তাহলে নিশিকান্ত শর্মার সঙ্গে যে মেয়েটিকে এইমাত্র দেখে এলাম, সে আর কস্তুরী এক মেয়ে নয়। হতে পারে না। ব্যস, আর কোনও উদ্ভট কল্পনাকে মাথায় স্থান দেওয়া হবে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। কস্তুরী মারা গেছে... বুরুজের নীচে পড়েছিল তার লাশ... উমা দেবী... কিন্তু সামনে যে...

আর একটু হুইস্কি চাই... হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে যায় কস্তুরীর সেই কথা ক-টি:

‘এর আগেও এখানে এসেছি আমি। অনেক... অনেকদিন আগে। আমার পাশে ছিল আর একজন পুরুষ... কালো চাপদাড়ি ছিল তার গালে...’

বোকা! বোকা! একদম বোকা আমি। এই সহজ কথাগুলোর অর্থ ধরেও ধরতে পারিনি এতদিন। যে কস্তুরীকে জেনেছি, তার সত্তা হঠাৎ একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল উমা দেবীর আবির্ভাবে। আর আজকে ওই যে মেয়েটি— ওর সত্তাকেও কি ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায় না কস্তুরীর আবির্ভাব দিয়ে?

রাত্রে আবার ডাইনিং রুমে মেয়েটিকে দেখলাম। নিচু গলায় ওয়েটারকে কী যেন বলছেন নিশিকান্ত শর্মা। আর হাতের ওপর থুতনি রেখে যেন স্বপ্ন দেখছে মেয়েটি। একটা হুইস্কি নিয়ে এসে বসলাম। ভাগ্যের কী পরিহাস! কোনও অভাবই ছিল না কস্তুরীর। আজ তারই সম্পত্তি ভোগ করছে অন্যজন, আর সে কিনা কণ্ঠলগ্না হয়ে রয়েছে নিশিকান্ত শর্মার মতো নারীমাংসলোলুপ একজন পুরুষের। মেয়েটির বিষণ্ণ চোখ দুটি উতলা করে তোলে আমার মনকে। কানের দুল দুটি অতি সাধারণ এবং বদরুচির পরিচায়ক। মুক্তোর রঙে পালিশ করা থাকত যে নখ— আজ তা শ্রীহীন। আর এক কস্তুরীর সুষমার সঙ্গে কী বিপুল প্রভেদ এই কস্তুরীর শ্রীহীনতার। এ যেন একটা সুন্দব ছবির অত্যন্ত খারাপ নকল। টুকটুক করে খাচ্ছিল মেয়েটি। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কী মনে পড়তে উঠে দাঁড়াল নিশিকান্ত শর্মা। সিধে হল থেকে বেরিয়ে গিয়ে উঠল লিফটে। দ্বিতীয় কস্তুরী বসে রইল চেয়ারে।

এই সুযোগ! নিশ্চয় কোনও কাজে ঘরে গেছে নিশিকান্ত। এ সুযোগকে কাজে লাগতে পারব কি আমি? এত সাহস কি হবে?

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে দিয়ে গটগট করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম মেয়েটির সামনে।

খুব আস্তে আস্তে চোখ তুলল সে; একটু বিরক্তি মিশোনো দৃষ্টি মেলে ধরল আমার মুখের ওপর।

বুকটা দমে গেল; তবুও জোর করে হেসে বললাম, 'বসতে পারি?'

অনিচ্ছার সঙ্গে নীরবে ঘাড় হেলিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলে মেয়েটি।

সময় নষ্ট করলাম না; বললাম, 'আমার নাম দুর্লভ সামন্ত। মনে পড়ছে?'

কপাল কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল মেয়েটি। তারপর বলল, 'না তো... মাফ করবেন।'

'আপনার নাম?'

'সুলতা মিত্র।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিলাম নিজেকে। সত্যিই তো, নাম তো এখন পালটে গেছে। পাশ থেকে আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখটা দেখতে লাগলাম। কপাল, চোখের রং, নাকের রেখা, উঁচু হনু— সব আগের মতো। স্মৃতির কোঠায় তুলে রাখা ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। চোখ বুজলে মনে হয় যেন জাদুঘরেই বসে রয়েছি— সামনে রয়েছে কস্তুরী। কিন্তু অমিলও আছে— খোঁপা বাঁধার কায়দা সেরকম নয়, লিপস্টিক সত্ত্বেও অধরোষ্ঠে নেই সেই শাণিত রেখা।

'আগে কলকাতায় থাকতেন?'

'না, বর্ধমানে।'

'ঠিক করে বলুন! ছবি আঁকতেন না?'

'না।'

'শ্যামনগরে কোনওদিন গেছেন?'

'সে কোথায়?'

'কেন মিথ্যে বলছেন?'

ভাসা ভাসা শূন্য দুটি চোখ মেলে ধরলে মেয়েটি। বললে, 'মাফ করবেন, মিথ্যে বলিনি।'

‘আজ সকালেই এ-ঘরে আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন আপনি। এখন এমন ভান করছেন যে—’

ভুরু কুঁচকে বলে মেয়েটি, ‘কী বলতে চান?’

দোষ নেই ওর। মনে মনেই বলি। অনেক বছর কেটে যাওয়ার পর কস্তুরী জেনেছিল সে উমা দেবী। আর আজকে এত সহজেই কি সুলতার মনে পড়বে নিজেকে? মনে পড়বে যে সে কস্তুরী, আর কেউ নয়?

‘নেশা করেছি আমি, কিছু মনে করবেন না।’ বিড়বিড় করে বলি আমি, ‘আমার রুম নাম্বার সতেরো; দরকার হলে চলে আসবেন।’

লিফট থেকে নিশিকান্তকে পা বাড়াতে দেখেই কথা শেষ করে এনেছিলাম, এখন চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলাম বারের দিকে। এক চুমুকে একটা হুইস্কি শেষ করে দিয়ে হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। রাতের খাওয়ার কথা আর মনেই ছিল না।

রুম-নাম্বার লেখা বোর্ডটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম— নিশিকান্ত শর্মা; এগারো নম্বর ঘর।

মাথার মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। ভয়! কিন্তু কীসের ভয়? নিশ্চয় চিনতে পেরেছে ও! আর যদি না চিনে থাকে, তাহলে এ-রহস্যের উত্তর থাকে তিনটি: হয় ভান করছে, না হয় স্মৃতিহীনতা, অথবা কস্তুরীই নয়।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই আবার সব মনে পড়ে গেল। উন্মাদ— মদের ঝোঁকে গত রাতে কী সব আবোল-তাবোল ভেবেছি। কটকে আর নয়; আগে স্বাস্থ্য— তারপর আসুক সুলতা মিত্র— রূপে যে দ্বিতীয় কস্তুরী!

বারান্দায় বেরিয়ে এসে টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে হঠাৎ চমকে উঠলাম, হনহন করে ফটক পেরিয়ে যাচ্ছে কে? নিশিকান্ত শর্মা না? সঙ্গে তো সুলতা মিত্র নেই!

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এগারো নম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিলাম— চেনা জনের আলতো টোকা।

‘কে?’

‘দুর্লভ।’

দরজা খুলে গেল; লাল চোখ— চোখের পাতা ফুলে উঠেছে। বেশবাস আলুথালু।

‘কী ব্যাপার সুলতা?’

আবার কেঁদে উঠল সুলতা।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ‘কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?’

‘আমাকে আর ভালো লাগছে না, তাই চলে গেল।’

একটুও উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে অপলক চোখে অশ্রুসিক্ত মুখটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। কস্তুরী— হ্যাঁ, সেই কস্তুরী... যে অভিনয় করেছে আমার সঙ্গে, হয়তো আরও অনেকের সঙ্গে। ট্রাউজারের পকেটে দুই হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে আমার। সামান্য বেঁকে যায় ঠোঁটের হাসি।

‘এই জন্যে এত কান্নাকাটি? ওকে তোমার যে-জন্যে দরকার, সে-জন্যে তার জায়গায় আমি তো এসেছি?’

আগের চাইতেও দরদরধারে ঝরে পড়ল সুলতার অশ্রু। ‘না... না... তুমি না!’

‘কেন নয়?’ আলতো করে চিবুকটি তুলে ধরে শুধোলাম আমি।

(৩)

.হাটেল কসমোপলিটান ছেড়ে নতুন হোটেলে এসেছিলাম শুধু খরচ কমানোর জন্যেই নয়। নিশিকান্ত শর্মার শ্যেন দৃষ্টিও এড়ানো গিয়েছিল অনায়াসে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করছিল সুলতা। লম্বা লম্বা কুচকুচে কালো চুলের রাশির দিকে তাকিয়ে আনমনে একটা সিগারেট লাগালাম ঠোঁটের কোণে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'তোমার এ খোঁপা বিশ্রী লাগে আমার। অন্যভাবে বাঁধতে পারো না?'

'কীভাবে?'

'ধরো বাঁ দিকের ঘাড়ের ওপরে সামান্য হেলিয়ে?'

ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলাম কথাটা। রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর। নতুন করে ঝগড়া বাধিয়ে কী লাভ? আজ ক-টা দিন ধরেই তো চলছে কথা কাটাকাটি, আর রাগারাগি। শুধু ঘুমের সময়টুকু ছাড়া দিবারাত্র খাঁচার বন্দি জন্তুর মতোই গজরাতে গজরাতে লড়ে চলেছি দু-জনে। বিরাম নেই থাবা আর দাঁত দেখানোর। কেন আবার নতুন করে সূত্রপাত করা সেই একই বাদানুবাদের?

তাড়াতাড়ি বললাম, 'নীচে আছি। তাড়াতাড়ি এসো।'

হুইস্কির আমেজে রিমঝিম করছিল মাথার কোষগুলো। মদ খেতে আর বাধা কী? আর তো কোনও সংশয় নেই। সুলতা মিত্র দিব্বি গেলে বলতে পারে কস্তুরী তার নাম নয়— কিন্তু আমি তো জানি সে কে। আকাশের ওই ধ্রুবতারা যদি সত্য হয়, তা হলে আমি যা জেনেছি তাও সত্য। শুধু অনুভূতি দিয়ে নয়, অনুমান দিয়ে, দেহের সমস্ত অণুপরমাণু দিয়ে

জেনেছি সেই সত্যকে। মাঝে মাঝে ভেবেছি, রক্ষিতা না হলেই কি চলত না কস্তুরীর? দৈহিক সুখ দেওয়ার জন্য কস্তুরীর ব্যগ্রতা দেখে কষ্ট পেয়েছি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সুলতা। চাপা ঠোঁটে নীরব বিদ্রোহ। শাড়ির রংটা মোটেই ভালো লাগল না আমার। শুধু শাড়ি কেন, ব্লাউজের রংটাও যেন বড্ড বেশি ঝকঝকে। বুক পেট বার করা অসভ্য ছাঁট। পায়ে চপ্পলের বদলে হাই হিল জুতোই ছিল ভালো। মুখটাতেও একটু অদলবদলের দরকার। গাল দুটো যেন আরও বসে গিয়ে উদ্ধত করে তুলেছে হনু দুটোকে। ভুরুতে পেন্সিলের দাগ অতটা না হলেও চলত। পালটায়নি শুধু চোখদুটি— শান্ত, সুন্দর, গভীর। একমাত্র অকাট্য প্রমাণ এই চোখ। নেমে এসেছিল সুলতা। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরি, বুকে টেনে নিই... আর... আর নিবিড় বাহুবন্ধনে শ্বাসরোধ করে দিই।

'খুব দেরি করিনি, কী বলো?' বলে সুলতা।

অনেকটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুর সুলতার কণ্ঠে। ঠিক সে রকমটি নয়। পরিবেশমতো মানানসই শব্দ চয়ন করতেও ভুলেছে কস্তুরী। আমার হাত ধরেছিল ও। ভীরু হাতে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত... দুর্লভ নয় মোটেই। আর আছে ভয়... সে ভয় আমার প্রতি। অসহ্য। বিরক্তিকর। নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিলাম আমরা। ভাবছিলাম, মাসখানেক আগেও যদি কেউ এসে বলত, কস্তুরীকে তুমি ফিরে পাবে এইভাবে, তাহলে আনন্দের আর সীমা পরিসীমা থাকত না।

কিন্তু আজ? চেয়ে পাওয়ায় যে এরকম বেদনা আছে, তা তো জানতাম না।

থরে থরে জিনিস সাজানো দোকানগুলোর কাচের জানলার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল সুলতা। এইতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার।

একটু রুক্ষস্বরেই বললাম, 'যুদ্ধের দিন ক-টা খুব অভাবের মধ্যেই কেটেছে— তা-ই না?'

'সত্যিই তা-ই।'

উচ্চারণে দারিদ্রের সুর অন্তর স্পর্শ করল আমার।

শুধোলাম, 'তারপরেই নিশিকান্ত শর্মা এল— যেটুকু ছিল, তাও গেল, কী বলো?' জানতাম, আঘাত পাবে সুলতা। তবুও না বলে পারলাম না।

'আমার কপাল ভালো তাই পেয়েছিলাম ভদ্রলোককে।'

এবার আঘাত পাওয়ার পালা আমার। এই তো চলেছে। আঘাত দেওয়া নেওয়ায় বিচিত্র খেলা। আমি কিন্তু সহ্য করতে পারলাম না।

'দেখো...' শুরু করেই থেমে গেলাম। কী লাভ? টানতে টানতে সুলতাকে নিয়ে এলাম শহরের মধ্যে।

অনুযোগের সুরে বলে উঠল সুলতা, 'দৌড়চ্ছ কেন? বেড়াতে বেরিয়ে এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোনও মানে আছে?'

জবাব দিলাম না। এবার দোকানের কাচের জানলা লক্ষ করার পালা আমার। অচিরেই দেখতে পেলাম যা চাইছিলাম।

কাউন্টারের সামনে এসে সংক্ষেপে বললাম, 'শাড়ি ব্লাউজ।'

'দোতলায় যান।'

মন স্থির করে ফেলেছি আমি। একটা তীব্র আনন্দ চিনচিন করছিল মনের মধ্যে। এবার স্বীকার করতেই হবে ওকে! জোর করে স্বীকার করাব...

'কী করছ?' ফিসফিস করে বলে সুলতা।

'চুপ করো।'

হুকুম দিলাম দোতলার কাউন্টারে, 'কিছু শাড়ি আর ব্লাউজ দেখান। সেরা জিনিস দেখাবেন।'

একটা টুলে বসে পড়লাম। যেন অনেকটা পথ একটানা দৌড়ে আসায় দম ফুরিয়ে গেছে— এমনিভাবে হাঁপাচ্ছিলাম আমি। পর পর কয়েকটা মূল্যবান শাড়ি নামানো হল কাউন্টারে। কিন্তু সুলতা দেখবার আগেই পছন্দ শেষ হয়ে গেল আমার। একটা কালো শাড়ি আর হলদে ব্লাউজ নিয়ে সুলতার হাতে দিয়ে হুকুম করলাম, 'দুটোই নাও। পরে দেখো— কীরকম মানায় দেখতে চাই আমি।'

দ্বিধা ফুটে উঠেছিল সুলতার মুখে। কিন্তু প্রতিবাদের সাহস হল না। তাই বোবার মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছোট্ট ঘেরা জায়গাটির দিকে। টুল ছেড়ে উঠে পড়ে পায়চারি করতে শুরু করলাম আমি। পুরোনো দিনের সেই উত্তেজনা নতুন করে উপলব্ধি করলাম। কস্তুরী আসবে— প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে বুকের খাঁচা। মনে হচ্ছে যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। আবার আগেকার জীবন ফিরে পেয়েছি। পকেটের মধ্যে চেপে ধরলাম আয়নাটা। অসহ্য হয়ে উঠেছে সাসপেন্স। এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে

চোখে পড়ল একটা বাদামি রঙের শাড়ি। একটা নয়। অনেকগুলো। কিন্তু কোনওটাই ঠিক সে রকম নয়। হুবহু কী রকম, তাও মনে করা সম্ভব নয়। স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতা নয় তো?

খুলে গেল কিউবিক্যাল-এর দরজা। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়েই নিদারুণ চমকে উঠলাম আমি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপা নারীমূর্তি... কস্তুরী আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কস্তুরী! সত্যিই কস্তুরী। আমাকে চিনতে পেরেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল নারীমূর্তি। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে... আরও কাছে... ফ্যাকাশে মুখ... রহস্যঘেরা কাজলকালো চোখ... আগের মতোই... কোনও তফাত নেই। না, না। এখনও তফাত আছে। সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কানের ওই দুল দুটোর জন্যে।

চাপা গলায় গর্জে উঠলাম, ‘খুলে ফেলো।’

সুলতা বুঝতে পারেনি তখনও, তাই নিজের হাতেই জোর করে টানাটানি করে খুলে ফেললাম দুল দুটো। তারপর পিছিয়ে ঘাড় কাত করে আপাদমস্তক চোখ বুলোলাম চিত্রশিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে। কোথায় যেন একটা খুঁত থেকে যাচ্ছে।

‘ঠিক আছে। ওই বাদামি শাড়িটাও নাও। এ সবই কস্তুরীর। জুতোর ডিপার্টমেন্ট কোনদিকে? এসো।’

বাধা দিল না সুলতা। কোনও জুতোই পছন্দ হচ্ছিল না আমার। দেখতে দেখতে জুতোর পাহাড় জমে গেল পাশে। সুলতা কি বুঝেছে কী চাই আমি? খুব সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত পেলাম চকচকে ছোট্ট জুতোজোড়া। সুলতার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললাম, ‘পরে দেখো। ঠিক আছে। হাঁটো।’

আঁটসাঁট কালো শাড়ি হলদে ব্লাউজ আর হাইহিল জুতোয় সুলতাকে মনে হল ইথার দিয়ে গড়া এক অশরীরী মূর্তি।

হাঁ করে কাউন্টারের ছোকরা তাকিয়েছিল আমার পানে। ক্যাশমেমো করতে বলে সুলতাকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম প্রমাণ সাইজ আয়নার সামনে।

‘দেখো। কস্তুরী, দেখো নিজেকে। ভালো করে দেখো।’

‘এ কী হচ্ছে!’ অনুনয়ের সুর।

‘থাক! মনে করে দেখো... চেষ্টা করো... আয়নার ওই ভদ্রমহিলা আর যে-ই হোক— সুলতা মিত্র নয়। চেষ্টা করো!’

প্রবল উত্তেজনায় জোরে জোরে ওঠানামা করছিল সুলতার বুক। ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিল মুখ।

এখনও শেষ হয়নি। টানতে টানতে সুলতাকে নিয়ে নেমে এলাম নীচে। খোঁপার কায়দা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে-খন। আপাতত দরকার সেই সুগন্ধি। চকিতে মনকে অতীতের পৃষ্ঠায় নিয়ে যেতে অদ্বিতীয় সেই কস্তুরীকে এখন দরকার। দেখাই যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। ফলাফল নিয়ে আর মাথা ঘামাই না আমি।

কিন্তু বৃথাই অনেক বোঝালাম, ঝরাফুল গন্ধের সঙ্গে তুলনা করলাম— কেউ বললে বুঝতে পারছি না, কেউ বললে যুদ্ধের আগে পাওয়া যেত। আজকাল আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু সে সুবাস না পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে অতীতের পুনরুজ্জীবন!

কনুইতে টান দিয়ে ফিসফিস করে উঠল সুলতা, ‘এই, কী ব্যাপার বলো তো?’

‘কী ব্যাপার? কিছুই কি এখনও বুঝতে পারছ না?’

চুপ করে শান্ত দুই চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল সুলতা।

ক্যাশে টাকা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম দু-জনে। দু-জনেই নিশ্চুপ।

কিছুক্ষণ পরে কথার খেই টেনে নিয়ে বললাম, ‘আমি চাই তোমার মধ্যেই তোমাকে আবিষ্কার করতে, আমি চাই যা সত্য, তা জানতে।’

কোনও জবাব দিল না সুলতা। আমার মুঠোর মধ্যে ওর নরম হাতের স্পর্শে উপলব্ধি করছিলাম আমার প্রতি ওর ভয় আর বিদ্বেষ। শক্ত করলাম মুঠি— আর ওকে পালাতে দেব না। কোনও মতেই না।

গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বললাম, ‘তুমি সুলতা মিত্র নও। কখনওই ছিলে না।’

প্রত্যুত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুলতা।

চকিতে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। এই প্রথম নয়, যতবারই ওকে এইভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনেছি, ততবারই মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমার। অসহ্য!

‘জানি, জানি, কী বলবে তুমি, আমি জানি। সুলতা মিত্র তোমার নাম, বোম্বাই তোমার জন্মস্থান। বাবার নাম বিরুপাক্ষ মিত্র, মায়ের নাম আয়েষা মিত্র।... অনেক... অনেকবার তো শুনলাম এই বৃত্তান্ত! কিন্তু... কিন্তু তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে, সব ভুল... সমস্ত ভুল... মারাত্মক ভুল!’

‘দোহাই তোমার। আবার কি গোড়া থেকে শুরু করবে নাকি?’

‘চেষ্টা করো... একটু চেষ্টা করো মনে করতে। মনে করে দেখো, তুমি আসলে কে? কী তোমার আসল নাম।... আচ্ছা, কখনও কঠিন অসুখ করেছিল তোমার?’

‘তেমন কিছু না—’

‘অনেক সময়ে অসুখের পর এ-রকম হয়।’

‘সেরকম কিছুই হয়নি আমার। বছর দশেক বয়েসে একবার হাম হয়েছিল।’

‘না, না, তা নয়।’

‘আমি আর পারছি না, রেহাই দাও আমাকে।’

ধৈর্য হারালে চলবে না। সহিষ্ণুতাই এখন আমার একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু কস্তুরীর জেদও তো বড় কম নয়— রাগ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কিউরিও শপের সামনে এসে পড়েছিলাম আমরা। শো-কেসে বিস্তর কাশ্মীরি শৌখিন জিনিস, মোরাদাবাদি পাত্র, প্রায়-জীবন্ত নেউল আর সাপ সাজানো দেখেই মাথায় একটা মতলব এল, সুলতাকে টেনে নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

ঢুকেই বুঝলাম ভুল করেছি।

পরপর চারটি ঘরে সাজানো ছিল মস্ত মস্ত অয়েল পেন্টিং, পাথরের অপরূপ সুন্দর মূর্তি, বিচিত্র ঝাড়লণ্ঠন, হাতির দাঁতের অদ্ভুত বাক্স আর পোর্সেলিনের খেলনা। মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা। এ-ঘরে সে-ঘরে নেই কোনও শব্দ। থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে আচম্বিতে সুলতারও কণ্ঠ নেমে এসেছে খাদে— আর চকিতে যেন ভোজবাজির মতোই পালটে গেল সমস্ত পরিবেশটা। মনে হল, সেদিনের মতোই আমরা পাশাপাশি নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি জাদুঘরের কক্ষে কক্ষে— আমার পাশেই হাতে হাত দিয়ে হাঁটছে রহস্যময়ী কস্তুরী কৌশিক— সুলতা মিত্র নয়।

প্রচণ্ড বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা। অব্যক্ত যাতনায় বোধহয় মুঠি আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল— সুলতা অস্ফুট শব্দ করে উঠতেই পলকের মধ্যে সামলে নিলাম নিজেকে।

সোনালি কারুকাজ-করা ফ্রেমে বাঁধানো একটা তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে শুধোলাম, 'এ-ধরনের ছবি তোমার ভালো লাগে?'

'না; ছবির সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না আমি।'

এবার আমারই বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পাশের ঘরে ঝুলছিল, সারি সারি শো-কেসে অজস্র জন্তুর চামড়া। বন্য আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটু রুক্ষ স্বরেই শুধোলাম, 'এবার বলো।'

'কী বলব?'

'সমস্ত; কে তুমি? কী করেছিলে তুমি? কেন করেছিলে তা?'

'উফ, ভগবান! কতবার আর বলব?'

'কলকাতায় কোনদিন যাওনি?'

'সাতদিনের জন্যে একবার গিয়েছিলাম।'

কী আশ্চর্য! এমনভাবে জেরা করছি সুলতাকে যেন মহা অপরাধে অপরাধিনী সে। এ ঠিক হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে আবার তিক্ততায় ভরে উঠল মমটা। দিশেহারা হয়ে এ কী করছি আমি?

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আবার রোদ, আর গাড়ি-ঘোড়ার নির্ঘোষের মধ্যে এসে যেন বাঁচলাম। আর নয়, অনেকক্ষণ ধরে নির্যাতন করা হয়েছে বেচারি কস্তুরীর ওপর — এবার ও একলা থাকুক। আমারও একলা থাকা দরকার... অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে।

'এ-ভাবে বেড়াতে ভালো লাগছে না তোমার, তা-ই না? এই নাও... যা তোমার দরকার, তা-ই নাও।' কয়েকটা দশ টাকার নোট সুলতার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'একলা একলা যতটা পারো ফুর্তি করে নাও... তারপর আবার দেখা হবে হোটেলে।'

নির্ভাষ চোখ মেলে নোটগুলি নিলে সুলতা; মুখে বললে, 'বেশি দেরি কোরো না।'

আবার রাগ হয়ে গেল নিজের ওপর, আবার ভুল করলাম আমি! কেন? কেন আমি রক্ষিতার মর্যাদা দিয়ে রাখছি সুলতাকে? এত পরিশ্রম একেবারেই বরবাদ হয়ে গেল সামান্য একটি ভুলে? নির্বোধের মতো আমিই তো তাকে না-সুলতা না-কস্তুরী বানিয়ে রাখছি।

বিশ-তিরিশ গজও যায়নি সুলতা, আচমকা নিঃসীম শঙ্কায় দুলে দুলে উঠল মনটা। রোদ্দুর ঝকমকে ফুটপাতের ওপর ওর চলার ভঙ্গিমা, কাঁধের দোলন, আর প্রতিবার পা

ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তন্বীদেহে ছোট ছোট হিল্লোলের সঙ্গে তো আমার আজকের পরিচয় নয়! এ যে চেনা... বড় চেনা... কতদিন দেখেছি এইভাবে তাকে চলে যেতে... ওই তো ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে ও... রাস্তা পেরোচ্ছে... সর্বনাশ! আর যদি ফিরে না আসে?

দু-হাত বাড়িয়ে কিছুটা ছুটে যাই আমি।

পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে যাই। মূর্খ! আর পালাবে না কস্তুরী... কোনও ভয় নেই... এত বোকা নয় ও... আমার মতো স্বর্ণহংসকে ফেলে অকারণে গা ঢাকা দেওয়ার মতো আহাম্মকি ও করবে না।

কিন্তু কেন এত দেরি হচ্ছে? কেন এত সময় নিচ্ছে কস্তুরী নিজেকে জাগিয়ে তুলতে? দুই সত্তায় দ্বন্দ্ব লেগেছে কি? এমনও হতে পারে তো, শেষ পর্যন্ত কস্তুরী আর ফিরে আসবে না... সুলতা মিত্রই হবে চিরস্থায়ী?

আচ্ছা, তা-ই যদি হয়, তবে কেন আমি সুলতা মিত্রকেই ভালোবেসে সুখী হতে পারছি না? কেন মিছিমিছি একটা অলীক কল্পনার পেছনে ছুটতে গিয়ে বিরামবিহীনভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষিয়ে তুলছি পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটুকু?... শেষ পর্যন্ত যদি আমার নিরন্তর সন্দেহ, বদমেজাজ, নির্যাতন আর বকাবকি সহ্য করতে না পেরে আবার উধাও হয়ে যায় কস্তুরী? হঠাৎ একদিন যদি সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যায়?

ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো মুহূর্তের মধ্যে অসাড় হয়ে গেল আমার পা-দুটো। সামনের ল্যাম্পপোস্টটা ধরে সামলে না নিলে পড়েই যেতাম ফুটপাতের ওপর। দুঃসহ এই সম্ভাবনার চিন্তাটুকুই যেন শ্বাসরোধ করে আনছিল আমার।

অনেকক্ষণ পর হৃদরোগীর মতো ধুকতে ধুকতে আবার পথ চলতে লাগলাম আমি। বেচারি কস্তুরী!... অযথা নির্যাতন করে নিষ্ঠুর আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছি বার বার... কিন্তু কেন... কেন কথা বলতে চাইছে না ও?

যদি হঠাৎ বলে? হঠাৎ যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমি মরে গিয়েছিলাম। শ্মশান থেকে উঠে এসেছি আমি। এই কালো চোখ দিয়ে আমি দেখেছি...'

সঙ্গে সঙ্গে কি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আছড়ে পড়ে নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে না আমার দেহ?

সত্যি সত্যি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি? কিন্তু যুক্তিকে মেনে নিলে এসব পাগলামো ছাড়া আর কী?

অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হোটেলের পথ ধরলাম। কাছাকাছি এসে ফুলের দোকান থেকে একটা গোলাপের তোড়া কিনলাম। ঘরের পরিবেশ খানিকটা পালটাবে ফুলের আর্বিভাবে। সুলতাও নিজেকে আর বন্দিনী মনে করতে পারবে না। গোলাপের তেজালো সুবাস মনকে মুহূর্তের মধ্যে উধাও করে নিয়ে গেল আর একটি দিনে... বিশ্বাসহন্তার মতোই ফিরে এল পুরোনো স্মৃতি। ঘরের দরজা খুলেই মনটা আবার তেতো হয়ে উঠল। খাটের ওপর শুয়ে রয়েছে সুলতা। পাশের টিপয়ের ওপর আছড়ে ফেলে দিলাম তোড়াটা।

'ভালো তো?' শুধোই আমি।

না, ভালো নেই সুলতা। কাঁদছিল ও... নিঃশব্দে জল ঝরছিল গাল বেয়ে বালিশের ওপর।

দুই মুঠি শক্ত করে ছুটে গেলাম সামনে, 'কী হয়েছে? বলো কী হয়েছে?'

নিরুত্তরে তবুও কাঁদতে লাগল সুলতা।

আস্তে আস্তে নিচু হয়ে ওর মুখটি আলতো হাতে ধরে ঘুরিয়ে দিলাম আলোর দিকে।

কস্তুরীকে কোনওদিন কাঁদতে দেখিনি আমি। তবে জলে-ভেজা মুখ একদিন দেখেছিলাম — গঙ্গার তীরে— জল থেকে উদ্ধার করার পর।

দুই চোখ মুদে বিড়বিড় করে উঠি অবরুদ্ধ কণ্ঠে, 'চুপ করো! থামাও কান্না! জানো না, তোমার কান্না আমাকে কতখানি কষ্ট...'

তারপরেই আচমকা রেগে গিয়ে মেঝের ওপর লাথি মেরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'চুপ করো! থামো!'

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সুলতা; আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নিলাম ওকে। মিনিটখানেক নিবিড়ভাবে বসে রইলাম দু-জনে। তারপর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'মাফ করো, আমার নার্ভ ঠিক নেই। ক্ষমা করো... আমি যে তোমায় ভালোবাসি... বড় ভালোবাসি!'

ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল দিনের আলো। নীচে রাস্তায় ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল একটা মোটর। চাঁদের আলো খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এসে পড়ল ওপাশের দেয়ালে। গোলাপের সুবাস ভাসছে ঘরের বাতাসে। সুলতাকে বুকে নিয়ে শান্ত হয়ে এসেছিলাম আমি। কী হবে অন্তহীন অনুসন্ধানে? একে নিয়েই তো সুখী আমি? কস্তুরীকে পেলে আরও

ভালো হত? কিন্তু এই চাঁদের আলোয় পাশে শায়িতা নারীমূর্তিকে কস্তুরী বলে কল্পনা করাও কঠিন। কস্তুরী হারিয়ে গেছে... চিরতরে বিদায় নিয়েছে।

'চলো, খেয়ে আসি।' ফিসফিস করে বলল সুলতা।

'না, থাক। খিদে নেই আমার।'

বড় ভালো লাগছিল এই বিশ্রামটুকু। এইভাবেই সারাটা রাত আমার পাশে শুয়ে থাকবে সুলতা... ভোরের আলো না ওঠা পর্যন্ত কাঁধের ওপর মাথা দিয়ে আমার বাহুবন্ধনে নিজেকে ছেড়ে দেবে ও... কস্তুরী... না... কস্তুরী নেই... ও দুটো নাম এক নয়... কোনওকালেই ছিল না... খামোকা দুইকে এক করার আর কোনও দরকার নেই, আর আমার ভয় নেই।

'আর আমার ভয় নেই।' বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি।

কপালে আলতো টোকা দিলে সুলতা। গালের ওপর উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। বাতাসে গোলাপের সৌরভ যেন আরও গাঢ়, আরও মদির হয়ে উঠছে, কোমল তন্বী দেহের উত্তাপ যেন আমার শরীরে প্রবেশ করছিল। চোখে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করছিল যে-হাত, অন্ধকারে মুঠির মধ্যে ধরলাম সেই হাতটি।

'এসো।'

আরও পাশে সরে এল তন্বীদেহ। হাতটা তখনও আমার মুঠির মধ্যে। তুলতুলে নরম আঙুল। এবার আমি চিনেছি... সেই হাড় বার-করা সরু কবজি, খাটো বুড়ো আঙুল, গোল গোল নখ। আমি যে ভুলতে পারছি না... কোনওদিনই পারব না... হু-হু করে মনটা পিছিয়ে গেল সেই দিনটিতে... চলন্ত গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে মানিকিউ করা হাত রেখেছে কস্তুরী... সেই একই হাত দিয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলে খুলছে আয়নার সুদৃশ্য মোড়ক... চোখ খুললাম আমি। পাশেই শুয়ে রয়েছে অনড় মূর্তি। মুহূর্তের জন্যে কান পেতে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনলাম আমি। তারপর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে ঝুঁকে পড়লাম অদৃশ্য মুখটির ওপর। আমার ঠোঁটের ছোঁয়ায় সামান্য কেঁপে উঠল অদৃশ্য চক্ষুপল্লব।

'কেন বলছ না তুমি কে?' বেদনাঘন কণ্ঠে শুধোই, 'সত্যিই কি তুমি বলবে না, তুমি কে?'

চোখ উপচে আবার গড়িয়ে পড়ল উষ্ণ অশ্রুধারা... নোনা-স্বাদে কি এত দুঃখ জমেছিল? রুমালটা কই? বালিশের নীচে নেই।

‘দাঁড়াও আসছি।’

খাট থেকে নেমে বাথরুমে গেলাম। ড্রেসিং টেবিলে অন্যান্য কসমেটিকস-এর মধ্যে সুলতার ভ্যানিটি ব্যাগ থাকে। ব্যাগ খুলে ভেতরে হাত চালালাম— নেই রুমালটা। রুমালের বদলে আঙুলে ঠেকল গোল গোল কয়েকটা দানা— নেকলেস। হ্যাঁ, নেকলেসই বটে। জানলার সামনে তুলে ধরতেই ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে চাঁদের মরা-আলো এসে পড়ল নেকলেসটার ওপর। মূল্যবান পাথরগুলো ওই ফ্যাকাশে আলোতেই জ্বলছে। হাত কাঁপতে লাগল আমার। সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই— এ নেকলেস উমা দেবীর।

(৪)

‘ল. ীটি, আর খেও না, অনেক হল।’

বলেই, আড়চোখে পাশের টেবিলগুলোয় তাকিয়ে নিলে সুলতা। না, কেউ শোনেনি। যে যার খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত।

ক-দিন ধরে আমিও লক্ষ করছি, আমরা দু-জনেই যেন একটা দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছি। বেশি দৃষ্টি আমার ওপরেই। সুলতা অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু আমি করি না। কাউকেই আর ভয় করি না আমি।

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ঠং করে নামিয়ে রাখলাম টেবিলের ওপর; বললাম, ‘তুমি কি মনে করো এত সহজে বেহেড হব আমি?’

‘না হলেও এত খেলে শরীর খারাপ হবে না?’

‘তা হবে। হলেই বা কার কী? এত মাথাব্যথা কেন? কুমিরের চোখে জল দেখলে লোকে বলবে কী?’

জ্বালা শুধু আমার কথাতেই ছিল না, চোখেও ছিল। চোখে চোখ রাখতে না পেরে মেনু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুলতা।

ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই হুকুম দিলে ও, ‘বাটার কেক। একটা।’

‘আমার জন্যেও একটা,’ বলি আমি। ওয়েটার এগিয়ে যেতেই ঝুঁকে পড়ে বললাম, ‘তুমি কিন্তু বেশি খেতে না... চার বছর আগে...’ ঠোঁট কেঁপে উঠল আমার; তবুও বললাম, ‘চার বছর আগে কত সাধ্যসাধনা করেও মিষ্টি খাওয়াতে পারিনি তোমাকে।’

‘তার মানে?’

'মানে আছে... মনে করে দেখো... একটু চেষ্টা করো মনে করতে... ফিরপোতে... তুমি বলতে তুমি শিল্পী...'

'আবার সেই গল্প!'

'হ্যাঁ, আবার সেই গল্প। জীবনে একবারই আমার সুখী হওয়ার গল্প।'

দ্রুত নিঃশ্বাস বইছিল আমার। পকেট হাতড়ে সিগারেট আর দেশলাই বার করার সময়েও চোখ সরালাম না আমি সুলতার মুখের ওপর থেকে।

'এত বেশি সিগারেট খাওয়াও উচিত নয়,' অস্পষ্ট স্বরে বলে সুলতা।

'জানি। সিগারেট খেয়ে ক্যান্সারকে নেমন্তন্ন করছি, তা জানি। কিন্তু আমি তো তা-ই চাই। মদ খেয়েই যদি আমি মরি—' সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা সুলতার চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে বলি, 'মদ খেয়েই যদি আমি মরি, তাতেই বা কী এসে যায়! তুমিও তো একদিন বলেছিলে আমাকে। বলেছিলে, মরতে আমার ভালো লাগে।'

নিরুত্তর রইল সুলতা।

'কোথায় বলেছিলে, তাও বলে দিতে পারি পারি আমি। গঙ্গার ধারে, জল থেকে ওপরে এসে...'

বলতে বলতে হেসে উঠেছিলাম। টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে সিগারেটের ধোঁয়ায় একটা চোখ ছোট করে কথা বলছিলাম। দুটো বাটার কেক টেবিলে রেখে গেল ওয়েটার।

'দুটোই খেয়ে নাও। আমার হয়ে গেছে!'

মিনতি মাখানো গলায় বলে ওঠে সুলতা, 'একটু আস্তে বলো। সবাই তাকিয়ে আছে এদিকে।'

'তাকাক না? আমার খিদে নেই— এ কথাটাও জোর গলায় বলতে পারব না? কী মুশকিল!'

'আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

'কিস্যু হয়নি... চামচ দিয়ে খাচ্ছ না কেন? আগে তো সেইভাবেই খেতে?'

প্লেটটা সরিয়ে রেখে ব্যাগটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুলতা। 'অসহ্য!'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যিই, প্রত্যেকেরই কৌতুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টি রয়েছে আমাদের ওপর। কিন্তু তাতে আমার কী? কে কী বলে, কী ভাবে, তা নিয়ে আর

মোটেই মাথা ঘামাই না আমি। অহোরাত্র যে বিষের জ্বালায় ছটফট করছি, তার অংশ যখন ওরা নিতে পারবে না, তখন পরোয়া কীসের?

সিঁড়ির গোড়াতেই ধরে ফেললাম সুলতাকে। পাশ দিয়ে একজন ওয়েটার নেমে যেতে যেতে অপাঙ্গে তাকিয়ে গেল আমার দিকে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিলে সুলতা। বড় ভালো লাগল আমার। কাঁদলেই হুবহু কস্তুরী হয়ে ওঠে সুলতা। আর কোনও তফাত থাকে না। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম দু-জনে। ঘরে ঢুকে সুলতা বিছানার ওপর ছুড়ে দিলে ব্যাগটা।

'এভাবে থাকতে পারব না আমরা... দিনে রাতে সর্বক্ষণ এক কথা... যা জানি না তা-ই নিয়ে আমাকে একনাগাড়ে খুঁচোনো সত্যি সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার... কালই চলে যাব আমি... নইলে পাগল করে ছাড়বে তুমি...'

কাঁদছিল সুলতা। অশ্রুর পাতলা স্তরের নীচে চিকমিক করছিল কাজল-কালো দুই চোখ।

বললাম, 'শ্যামনগরে নীলকুঠির সামনে সেই বুরুজটা মনে পড়ে?... চোখ বুজে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলে তুমি... তারপর যখন উঠে দাঁড়ালে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল— ঠিক আজকের মতো।'

ধপ করে বিছানার কোণে বসে পড়ল সুলতা। ফিসফিস করে শুধোলে, 'শ্যামনগর?'

'হ্যাঁ, শ্যামনগর... মরতে বসেছিলে তুমি?'

'মরতে বসেছিলাম?... আমি?'

আচম্বিতে শয্যার ওপর মুখ গুঁজড়ে আছড়ে পড়ল সুলতা। কান্নার ধমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তন্বীদেহ। পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে যেতেই সরে গেল ও।

'ছুঁয়ো না আমাকে,' কান্নায় ভেজা বিকৃত স্বর।

'আমাকে ভয়?'

'হ্যাঁ, তোমাকে, তোমাকে, তোমাকে।'

'মাতলামির জন্যে?'

'না।'

'তবে?'

সব চুপ।

'আমি উন্মাদ, তা-ই না?'

‘হ্যাঁ।’

উঠে দাঁড়ালাম আমি। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারিনি। তারপর বলেছিলাম বিড়বিড় করে, ‘অসম্ভব নয়... হলেই বা কী এসে যায়... আচ্ছা, ওই নেকলেসটা... না, না, বলতে দাও আমাকে... নেকলেসটা গলায় দাও না কেন?’

‘ভালো লাগে না বলে— আর কতবার বলতে হবে?’

‘ভালো লাগে না? না, পাছে আমি ধরে ফেলি... কোনটা সত্যি?’

‘ভালো লাগে না।’

‘এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েও যদি বলো এ কথা...’ জুতো দিয়ে কার্পেটে দাগ টানতে টানতে বলি, ‘নিশিকান্ত শর্মার উপহার, তা-ই না?’

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে খাটের ওপর দুই পা তুলে নিলে সুলতা। বললে, ‘নিশিকান্তবাবুর কাছে শুনেছিলাম, চায়না টাউনের একটা দোকান থেকে নেকলেসটা কিনেছিলেন উনি।’

‘কত দিন আগে?’

‘তাও বলেছি তোমাকে। বার বার একই কথা কেন বলাচ্ছ বলো তো?’

‘কতদিন আগে?’

‘ছ-মাস।’

‘মিথ্যে কথা।’

‘মিথ্যে বলে আমার লাভ?’

‘স্বীকার করে নিলেই সব গোল চুকে যায়। তুমিই কস্তুরী কৌশিক।’

‘না। দোহাই তোমার, ও-নাম আর শুনিও না। আমি আর পারছি না। সে মেয়েকে এখনও যদি তুমি এতই ভালোবাসো তো আমাকে রেহাই দাও... কালই বিদায় নেবে আমি... যথেষ্ট হয়েছে, সহ্যের সীমা আমার ছাড়িয়েছে।’

‘সে মেয়ে... মারা গেছে, আর...’

কথা ফুটছিল না গলায়, কাশতে গিয়ে গলা জ্বলে গেল। তবুও বললাম, ‘মারা গেছিল... কিছুদিনের জন্যে... তাও সম্ভব। কী বলো?’

‘না।’ অব্যক্ত বেদনায় যেন গুঙিয়ে ওঠে সুলতা, ‘দোহাই তোমার। থামো।’

আবার আতঙ্কের একটা ফিনফিনে মুখোশ দুলে ওঠে সুলতার আবেগ-থরথর মুখের ওপর।

সরে গেলাম আমি।

বললাম, 'ভয় পেও না। তুমি তো জানো, তোমাকে আঘাত দিতে আমি চাই না... মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলি বটে, কিন্তু সে তো আমার দোষ নয়... দেখো তো, চিনতে পারো?'

ফস করে পকেট থেকে ঝকমকে আয়নাটা বার করে ছুড়ে দিলাম শয্যার ওপর। যেন সাপ দেখেছে এমনিভাবে ভয়ার্ত চিৎকার করে কুঁচকে সরে গেল সুলতা।

'দেখো, দেখো... ভালো করে দেখো!... হাত দাও... সাপ-বিছে তো নয়, সামান্য একটা আয়না... কামড়াবে না, ভয় নেই... কী? মনে পড়ছে কিছু?'

'না।'

'মিউজিয়ামে যাওয়া?'

'না।'

'তোমার লাশের পাশ থেকে তুলে নিয়েছিলাম এই আয়না... অবশ্য তা তোমার মনে পড়বে না।'

চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলাম শেষের কথাগুলো। আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে সুলতা।

'সরে যাও... সরে যাও সামনে থেকে... একলা থাকতে দাও আমাকে।'

একই সুরে বলি আমি, 'রেখে দাও— এ জিনিস তোমার।'

অশুভ নক্ষত্রের মতোই দু-জনের মাঝে থেকে চিকমিক করতে লাগল আয়নাটা। ওপাশে সুলতার ভয়করুণ মুখ দেখে অকস্মাৎ বুকটা টনটনিয়ে উঠল আমার। এ কী করছি আমি? মিছিমিছি কেন যন্ত্রণায় নীল করে তুলছি ওর মনকে? কিন্তু সত্যিই কি মিছিমিছি?

দপদপ করে উঠলো রগের শিরাগুলো। সোরাই থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিলাম। এখনও শেষ হয়নি প্রশ্নের তূণ... আরও অনেক প্রশ্ন-শর নিক্ষেপ করে ক্ষতবিক্ষত করে তুলতে হবে ওর বিস্মৃত মনকে... তবেই যদি... তবেই যদি... কিন্তু তার আগে আবার সহজ করে তুলতে হবে কস্তুরীকে। ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু

হয়ে গেছে বেচারি... একটু একটু করে মুছে দিতে হবে ওর আতঙ্ক... তারপর?... তারপর সুলতার রক্ত-মেদ-মজ্জার মধ্যে আবির্ভাব ঘটবে কস্তুরীর। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলাম আমি।

'আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে যেতে দাও!' ককিয়ে উঠল সুলতা।

'কোথায় যাবে?'

'যেদিকে দু-চোখ যায়।'

'আমি আর তোমাকে ছোঁব না সুলতা, কথা দিচ্ছি... অতীত নিয়ে আর কোনও কথাই বলব না।'

দ্রুত নিঃশ্বাস বইছিল সুলতার। পেছন ফিরে জামা খুলতে খুলতে বেশ বুঝলাম। একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে আছে ও।

ফিরে দাঁড়াতেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল সুলতা 'তোমার পায়ে পড়ি— চোখের সামনে থেকে সরাও আয়নাটা।'

'রাখবে না তুমি?'

'না। একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে। আমি আর পারছি না... আর পারছি না।'

মমতায় ভরে উঠল সমস্ত মন। পাশে গিয়ে বললাম, 'কাঁদছ কেন, কস্তুরী? তোমাকে কাঁদানোর সত্যিই কোনও ইচ্ছে নেই আমার।' আলতো হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে গাঢ়স্বরে বললাম, 'কেঁদো না কস্তুরী... কেঁদো না... কেন কাঁদছ?'

বুকের মাঝে মাথা টেনে নিলাম ওর। নিবিড় প্রেমে ধীরে ধীরে দোলা দিতে দিতে বলতে লাগলাম ফিসফিস স্বরে, 'মাঝে মাঝে কী যে করি, নিজেই বুঝি না... ভুলতে না পারার যন্ত্রণা যে কত মর্মান্তিক, তোমাকে বোঝাতে পারব না... পাঁচজনের মতো ওর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে হয়তো এত কষ্ট পেতাম না আমি... হয়তো এতদিনে ভুলেও যেতাম... কিন্তু... আজ তোমাকে বলতে পারি... আত্মহত্যা করেছিল কস্তুরী। বুরুজের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে এ পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিল কস্তুরী। কিন্তু কেন? কেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল... চার বছর ধরে একনাগাড়ে এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের আশায় পাগল হতে বসেছি আমি।'

উত্তরে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সুলতার বুক ঠেলে।

'সব কথাই বললাম তোমাকে। তুমি আমার... তুমি আমার... ভালো তাকে আমি এখনও বাসি, বাসব। তোমাকেও বাসি। দুটো ভালোবাসাই যে এক... কোনও তফাত নেই। ভালো আমি একজনকেই বেসেছি— দু-জনকে নয়। তুমি যদি একটু চেষ্টা করো... ওগো, একটু চেষ্টা করো মনে করতে, তাহলেই...'

সুলতার মাথা নড়ে উঠল আমার বুকের ওপর। আরও জোরে চেপে ধরে বললাম, 'না, না, শেষ করতে দাও... গত ক-দিনে আমি যা অনুভব করেছি, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছি— তা বলবার সুযোগ আমাকে দাও।'

হাত বাড়িয়ে বেডল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলাম। একান্ত নিবিড় হয়ে বসেছিলাম দু-জনে... ভেসে চলেছিলাম অন্ধকারের নিঃসীম দরিয়ায়... একটু সোজা হয়ে বসতে পারলে ভালো হত... টনটন করছিল হাতটা, কিন্তু নড়তে সাহস হল না আমার... নিরন্ধ্র তমিস্রায় বিলীন হয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে চললাম, 'মরতে আমি বড় ভয় পাই ছেলেবেলা থেকেই... এই ভয় আমার আছে... অপরকে মরতে দেখলেও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছি আমি... ছেলেবেলায় রাত্রে হরিবোল চিৎকার শুনে আঁতকে উঠে ঘুমের ঘোরেই জড়িয়ে থাকতাম মা-কে... জীবনে শ্মশানে যাইনি ভয়েতে... কখনও ভেবেছি সব সত্যি... কখনও ভেবেছি সব মিথ্যে... কিন্তু আজ আর কোনও দ্বিধা আমার নেই... তোমার মধ্যেই জেনেছি, কিছুই মিথ্যে নয়, সব সত্যি... ওগো, কথা কও... একটি বারের জন্য তুমি যদি বলো, স্বীকার করো... তাহলে চিরকালের মতো জুড়িয়ে যায় আমার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে-যাওয়া মনটা।'

অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার দিয়ে গড়া সুলতার মুখে মনে হল কোনও চোখ নেই। শুধু কপাল, গাল আর চিবুকের রেখা দেখা যাচ্ছিল ম্লান আভায়। পরিপূর্ণ ভালোবাসায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল আমার দগ্ধ অন্তর। একদৃষ্টে শূন্য অক্ষিকোটরের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম বসন্তের বাতাসের চেয়েও হালকা সুরে জবাব দেবে কস্তুরী, বলবে এমন একটি কথা...

ঘন গলায় বললাম, 'লক্ষ্মীটি, ওভাবে তাকিয়ে থেকো না— কিছু বলো।'

ডান হাতটা অবশ হয়ে গেছিল আমার। শুধু হাত কেন, পুরো ডান দিকটাই অসাড় মনে হচ্ছিল। মনে পড়ল, গঙ্গার বুক থেকে টেনে টেনে কস্তুরীকে তুলে আনার দৃশ্যটি। কিন্তু আজকে আর জীবনের জন্য কোনও সংগ্রাম নয়... আজ আমি চাই নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিতে এমন একজন নারীর হাতে— রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান যে জানে...

ঘুম পাচ্ছে... চিন্তাধারাও আর স্বচ্ছন্দ নয়... এলোমেলো... কথা বলতে চাইলাম... পারলাম না... রাশি রাশি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল সবকিছু...

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে অনাবিল শান্তি অনুভব করলাম। মনে হল, আর কোনও সমস্যা, যন্ত্রণা আমার নেই। কস্তুরী বড় বড় চোখ মেলে অপলকে তাকিয়েছিল আমার পানে। দেখতে দেখতে অশ্রু টলমল করে উঠল কালো দিঘির মতো দুই চোখের কানায় কানায়।

উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম মাথায় যন্ত্রণা। হুইস্কির প্রতিক্রিয়া। কনুইয়ের ওপর আধশোয়া অবস্থায় দেহ ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'সুলতা!'

'বলো,' কান্নায় ভেজা স্বর।

'সত্যিই আমাকে ভালোবাস তুমি?'

কোনও জবাব নেই।

'আচ্ছা, ঘুমের ঘোরে নিশ্চয় আবোলতাবোল বকেছি আমি, তা-ই নয়?'

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে সুলতা বললে, 'না, কিছুই বলোনি। কিন্তু কথা পরে, আগে বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।'

'তোমার?'

'আমার হয়ে গেছে, চুল ভিজে দেখতে পাচ্ছ না?'

স্খলিত চরণে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময়ে দেখি, তখনও আশ্চর্য গভীর দৃষ্টি মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে সুলতা।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দেখি, আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে ও।

চোখ ছোট করে লক্ষ করতে লাগলাম কেশচর্চা। অনেক রোগা মনে হচ্ছে সুলতাকে। তবে কি আমার চাইতেও বেশি নিগ্রহ ভোগ করছে ওর আত্মা? খোঁপা বাঁধতে শুরু করতেই আবার নিজেকে সামলাতে পারলাম না— হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম চিরুনিটা, 'দাও আমাকে— ওভাবে নয়।'

একটা চেয়ার টেনে বসলাম ঠিক পেছনে।

'এ খোঁপা মোটেই মানায় না তোমায়— আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হালকা সুরে বললেও গলা কেঁপে গেল আমার। অধীর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল আঙুল। ভারী মিষ্টি একটা সৌরভ উঠছিল চুল থেকে, অজানা সুবাস, কিন্তু নিমেষে হালকা হয়ে যায় মনটা। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দেখি, ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে আছে সুলতা, মুক্তোর

মতো দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে অধর। কিন্তু বাধা দিলে না। জানে, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই, তাই বুঝি নিঃশেষে ছেড়ে দিলে নিজেকে আমার খেয়ালের হাতে। আস্তে আস্তে একপাশে কাঁধের ওপর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল বিচিত্র খোঁপাটা। কাঁটার পর কাঁটা লাগিয়ে চললাম আনাড়ি হাতে। বহু দিবস, বহু রজনীর মধ্যে দিয়ে জাগরুক স্মৃতিপটে আঁকা সেই মুখটিকে ফুটিয়ে তুলতে চাই আমি— শিল্পীর মতো রঙের পর রং চড়িয়ে ক্যানভাসের বুকে আমার মানসীকে— ধ্যানের কস্তুরীকে।

আশ্চর্য। সত্যি সত্যিই ফুটে উঠছে যে সেই মুখ— যে মুখের স্মৃতি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হতে বসেছি আমি। ওই তো সেই চারুললাট, নিখুঁত কর্ণযুগল! শেষ কাঁটাটা গুঁজে দিয়ে ঘাড় কাত করে তন্ময় হয়ে রইলাম আমার সৃষ্টির পানে।

সার্থক আমার প্রচেষ্টা। দর্পণের বুকে সোনালি রোদের মাঝে জলরঙে আঁকা ছবির মতোই স্পষ্ট, নিখুঁত অথচ পাংশু এ মুখের রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাত।

'কস্তুরী!'

অস্ফুট স্বরে অজ্ঞাতসারেই চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু কস্তুরী তা শুনতেই পেল না। তবে কি দর্পণের বুকে আমি যা দেখছি তা প্রতিবিম্ব নয়, জীবন্ত? না, মরীচিকা, চোখের মায়া? চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘুরে গিয়ে সামনে থেকে দেখলাম আমি। সেই মুখ। না, ঠকিনি আমি— এ সেই কস্তুরীই বটে।

আমার মর্মভেদী, এবং সম্ভবত উদ্‌ভ্রান্ত, দৃষ্টির সামনে বুকের পাঁজর খালি করে দিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুলতা। হাসবার চেষ্টা করল; বলল, 'আর কিছুক্ষণ পরে তো ঘুমিয়েই পড়তাম।' তারপর আয়নার বুকে একঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মন্দ কী, নতুন ফ্যাশান। তবে ক-সেকেন্ড থাকে, সেইটাই প্রশ্ন।'

বলে, মাথার এক ঝাঁকুনিতেই এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল কাঁটাগুলো, কালো মেঘের মতো চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়ল পিঠের ওপর। হাসতে হাসতে আমার গায়ে গড়িয়ে পড়ল সুলতা।

আমিও হাসলাম। হেসে স্বস্তি বোধ করলাম।

সূর্য যখন মধ্যগগনে, তখনও মাথা টিপে দিচ্ছিল সুলতা। এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টপ করে উঠে পড়ে বলল, 'চলো।'

সচমকে বললাম, 'কোথায়?'

মুখ টিপে হেসে জবাব দিলে সুলতা, 'খেতে হবে না?'

'তুমি যাও... আচ্ছা, চলো... কিন্তু মাথার যন্ত্রণা...'

শান্ত সুন্দর দৃষ্টি মেলে ধরলে সুলতা, 'ভয় কীসের, আমি তো চলে যাচ্ছি না... তোমার খেতে ভালো না লাগলে শুয়ে থাকো। এখুনি আসছি আমি।'

আমার অবচেতন শঙ্কার জবাব দিয়েছে সুলতা। শরীরটা সত্যিই ভালো নেই। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা... কিন্তু কস্তুরী যদি না আসে? মিথ্যে ভয়... মরিয়া হয়ে বললাম, 'না, ভয় কীসের। যাও তুমি, তাড়াতাড়ি এসো।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি। যাও, আমি বলছি যাও।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আবার নিদারুণ উদ্বেগে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। জানি, বৃথা আমার এই শঙ্কা। ওর সব জিনিসই রয়েছে এ-ঘরে... সব ছেড়ে কি কেউ যেতে পারে? অসম্ভব!

কিন্তু হায়রে অবুঝ মন! সেকেন্ড কয়েক পরেই মনে হল, আমি সব পেয়েও আবার সব হারাতে বসেছি। সঙ্গে সঙ্গে আতীব্র বেদনায় ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আলনা থেকে জামাটা টেনে আর কিছু না ভেবেই তরতর করে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে।

খাবার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। ধক করে উঠল বুকটা।

সুলতা নেই ভেতরে। উত্তাল হৃৎপিণ্ডটা মনে হল, এইবার বুঝি বিকল হয়ে যাবে। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসেছিলাম প্রধান তোরণে।

রাস্তাটা সোজা গিয়ে যেখানে মোড় নিয়েছে ডান দিকে, ঠিক সেইখানে দেখা গেল হনহন করে এগিয়ে চলেছে একটি মূর্তি। বাদামি শাড়িটি আঁটসাট করে জড়ানো তন্বীদেহে। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যে হিল্লোল উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত— তার প্রতিটি আমি চিনি। প্রখর সূর্যালোকে দীর্ঘ চার বছর পরে ফিরে আসা কস্তুরী কৌশিক অদৃশ্য হয়ে গেল পথের মোড়ে।

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার; কুয়াশার পর্দা দুলে দুলে উঠছে চোখের সামনে। আমি কি মূর্ছা যাব? না, না, আমাকে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। পিছু নিতে হবে ওই

রহস্যময়ী নারীমূর্তির— জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে দোলকের মতো নিরন্তর রয়েছে যার আসা-যাওয়া।

ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি রাস্তায়— মোড়ের মাথায় এসেই আবার দেখতে পেয়েছিলাম সেই শরীরী প্রহেলিকাকে। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সে যেদিকে, সেদিকে এর আগে ওকে আমি কোনওদিন আসতে দেখিনি। কিন্তু পথঘাট তার নখদর্পণে। সমানে লেগে রইলাম পেছনে। পলকের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেছে মাঝের চারটি বছর। পুরোনো দিনে ফিরে গেছি আমি— পিছু নিয়েছি কস্তুরী কৌশিকের। নতুন করে কোষে কোষে অনুভব করলাম সেই অবর্ণনীয় উত্তেজনা আর শিহরণ। কস্তুরী... কস্তুরী... কস্তুরী... স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসা কস্তুরী ওই তো এগিয়ে চলেছে সামনে... অভ্যস্ত চরণে এ-পথ ও-পথ ঘুরে এসে চকিতে অন্তর্হিত হয়ে গেল সে একটা দোতলা বাড়ির মধ্যে।

থমকে দাঁড়ালাম আমি। এক মিনিট... দু-মিনিট... পাঁচ মিনিট কেটে গেল— কিন্তু কাউকেই বাইরে আসতে দেখলাম না।

দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেলাম কাছে— ছোট্ট ফলকটা চোখে পড়ল তখনই— সাদার ওপর কালো হরফে শুধু দুটি শব্দ, 'দুর্গা হোটেল।'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করেছিলাম। তারপরেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলাম ভেতরে— সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম টেবিলের ওপাশে গান্ধী-টুপি-পরা ছোকরার সামনে।

'এই মাত্র যে ভদ্রমহিলা এলেন, ওঁর নামটা জানতে পারি?'

'উমা দেবী। কিন্তু কেন বলুন তো?'

(৫)

সুলতা যখন ফিরে এল, আমি তখন চিত হয়ে . য়ে খাটের ওপর।

'বড্ড দেরি হয়ে গেল। রাগ করোনি তো?'

'না, রাগ করব কেন।'

'শরীর কীরকম? মাথার যন্ত্রণা কমেছে?' পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে সুলতা।

উত্তপ্ত মাথাটা যেন জুড়িয়ে গেল শীতল করস্পর্শে।

বললাম, 'কই আর কমলো। অ্যাসপিরিন খেয়েও কিছু হচ্ছে না।'

অ্যাসপিরিন খেয়ে আকাশপাতাল ভাবলে কি মাথা সারে? একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি বরং একটু ঘুরে আসি।

সচকিত হয়ে শুধোলাম, 'কোথায়?'

'স্নো-টা ফুরিয়েছে। আরও দু-একটা জিনিস কেনা দরকার। যাব আর আসব।'

চুপ করে রইলাম। কী জবাব দেব? এইমাত্র যা দেখে এলাম, যা শুনে এলাম, তারপরেও কি সুলতাকে চোখের আড়াল করা উচিত?'

চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সুলতা বললে, 'কিছু বলছ না কেন? যেতে দিতে মন সরছে না বুঝি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'সুলতা, আমাদের পরস্পরের কাছে কে যে বন্দি, আর কে মুক্ত, তা তুমি ভালো করেই জানো। কাজেই তুমি যেতে চাইলে আটকে রাখার ক্ষমতা তো আমার নেই।'

কথাটার অর্থ অনেক। কিন্তু যেন কিছু না বুঝেই সরল চোখে বললে সুলতা, 'ও-কথা বলছ কেন?'

'বড় ভয়, সুলতা, বড় ভয়। যদি বুঝতে...'

উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল সুলতা। বললে, 'তোমার এই অসুখ শুধু ভয় থেকেই। ভয়টাকে জয় করতে পার না?'

চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। শুধু চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ আর চিরুনি। কাঁটা রাখার আওয়াজ থেকে বুঝলাম প্রসাধন নিয়ে তন্ময় হয়ে রয়েছে সুলতা। বড় নিঃসহায় মনে হল নিজেকে। দুর্গা হোটেলে উমা দেবীর আবির্ভাবের পর থেকেই যেন একটা দুর্ভেদ্য অদৃশ্য প্রাচীর উঠে গেছে আমাদের মধ্যে। আরও অবোধ্য হয়ে উঠেছে সুলতা।

টুল সরানোর শব্দ শুনলাম। তারপরেই পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল। পরক্ষণেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম আমি।

সামনেই দাঁড়িয়ে কস্তুরী। কাঁধের ওপর বিচিত্র ফ্যাশনের খোঁপা। হালকা লিপস্টিকে উজ্জ্বল ধারালো অধরোষ্ঠ। সারা মুখে ঝকমক করছে এক দুর্বোধ্য হাসি— মোনালিসার হাসি।

বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দেখছিলাম সেই নারীমূর্তিকে, দীর্ঘ চার বছর যার স্মৃতি নিয়ে উন্মাদ হতে বসেছি আমি।

'ভালো লাগছে তোমার?' অদ্ভুত সুরে শুধোল সুলতা।

প্রত্যুত্তরে গলা দিয়ে খানিকটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরোল— কথা ফুটল না।

'আমাকে এইভাবে সাজাতে তোমার ভালো লাগে— তাই এই খোঁপাই বাঁধলাম। ঠিক হয়নি?'

'হয়েছে।' অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলি আমি।

'তাহলে আমি যাচ্ছি।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসি আমি, 'তুমি... তুমি... ফিরে আসবে তো?'

বিলোল কটাক্ষ হেনে জবাব দিল সুলতা, 'ছেলেমানুষি কোরো না। ফিরে আসব না তো যাব কোন চুলোয়?'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

শূন্য ঘরে অভিভূতের মতো বসে রইলাম আমি। সমস্ত মাথাটা লোহার মতো ভারী মনে হচ্ছে। যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রতিটি স্নায়ু— এমনি যন্ত্রণা। কিন্তু এ কী করলাম আমি? এইমাত্র যে রূপসী বিদায় নিয়ে গেল বিচিত্র হেসে— তাকে তো এর আগেও একবার হারিয়েছি নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে... এ বিদায়ও কি শেষে...? না... আমি যেতে দেব না... যেতে দেব না... কিছুতেই চোখের আড়ালে যেতে দেব না।

মাথার যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়লাম শয্যা ছেড়ে। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তায় পড়ে দেখেছিলাম ধীর পদক্ষেপে কস্তুরীকে এগিয়ে যেতে।

অলস চরণে অনেকক্ষণ হেঁটেছিল কস্তুরী। একটা মনিহারী দোকানে ও ঢুকেছিল। তারপর আবার শুরু হয়েছিল পথপরিক্রমা। শহরের এদিকে কোনওদিন আসার সুযোগ হয়নি আমার। রাশি রাশি ড্রামের পাহাড়। বাঁশ আর শাল কাঠের আড়ত। মাঝে মাঝে মোষের খাটাল। কোথাও থামল না কস্তুরী। সব কিছু পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা মস্ত পুকুরের সামনে।

ক্ষিপ্তের মতো পেছন পেছন আসছিলাম আমি। ধাক্কা খেয়ে পথচারিরা সবিস্ময়ে তাকিয়েছে, গালি দিয়েছে, সশব্দে ব্রেক কষে বাপান্ত করেছে মোটর ড্রাইভার— কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিনি আমি। মাথার যন্ত্রণায়, উদ্বেগে আতঙ্কে মুহ্যমানের মতো ছুটে চলেছিলাম। কোথায় চলেছিলাম, সে খেয়াল ছিল না। পুকুরের সামনে এলে সম্বিত ফিরে পেলাম।

এ যেন সিনেমা দৃশ্যের মতো অতীতের পুনরাবৃত্তি। এমনি করেই তো কস্তুরীর পিছু নিয়ে কখনও তাকে দেখেছি দুধসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে, কখনও গঙ্গার পাড়ে পায়চারি করতে। দৃশ্য হুবহু এক হলেও উদ্দেশ্য পালটেছে। চার বছর আগে কস্তুরীকে হারানোর ভয়ে তাকে চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করেছিল মহেন্দ্র কৌশিক। আর চার বছর পরে সে ভয় আমাকেই প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। আজকের পিছু নেওয়া শুধু আমার জন্যেই— মহেন্দ্রর জন্যে নয়। একই নাটকের বিচিত্র পুনরাবৃত্তি... কিন্তু ও কী?

পুকুর পাড়ে ঘাস জমির ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ফেলল কস্তুরী। তারপর একটা কাগজ আর একটা ফাউন্টেন পেন বার করে ঝুঁকে পড়ল কাগজের ওপর। মিনিট পাঁচেক পরে কলম মুড়ে ভাঁজ করে একটা খামের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়াল ও।

গঙ্গার তীরেও এমনিভাবে চিঠি লিখে এসে দাঁড়িয়েছিল কস্তুরী। টুকরো টুকরো কাগজ ছড়িয়ে পড়েছিল ভাগীরথীর জলে... তারপর...

আর ভাবতে পারলাম না। কীরকম যেন হয়ে গেলাম। মরিয়ার মতো ছুটে যেতেই দারুণ চমকে ঘুরে দাঁড়াল সুলতা। চিঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। হাত ফসকে গিয়ে হাওয়ার টানে খামটা গিয়ে পড়ল পুকুরের জলে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। চোয়ালের হাড় শক্ত করে শুধোলাম, 'কী লিখেছিলে চিঠিতে?'

দৃপ্ত ভঙ্গিতে মুখ টিপে দাঁড়িয়ে রইল সুলতা, কোনও জবাব দিল না।

'আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলে তা-ই না?'

'হ্যাঁ!'

'কিন্তু কেন? কেন?'

'আর সহ্য করতে পারছি না আমি। আর বেশিদিন এভাবে থাকলে পাগল হতে হবে আমাকে।'

'চিঠিটা পোস্ট করবার পর কী করবার মতলব এঁটেছিলে? দু-হাতে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে শুধোই আমি।

'চলে যেতাম... কালকেই যেতাম...'

'আর আমি?'

জবাব দিল না সুলতা।

আচমকা উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসে। আমারও শরীর-মন যেন ভেঙে পড়তে চাইল। ক্লান্ত স্বরে বললাম, 'চলো, ফেরা যাক।'

কাদা প্যাচপেচে সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরে চললাম আমরা। শক্ত মুঠিতে সুলতার কবজি চেপে ধরেছিলাম আমি— প্রণয়ীর মতো নয়— পুলিশম্যানের মতো। একটা সূক্ষ্ম তৃপ্তি অনুভব করছিলাম মনে মনে। কস্তুরীকে আমি আবার ফিরিয়ে এনেছি মৃত্যুর উপত্যকা থেকে।

'তুমিই কস্তুরী। তা-ই নয়?'

'না।'

'এ পশ্নের জবাব পাওয়ার অধিকার আমার এসেছে। আমি বলছি, তুমিই কস্তুরী, তুমিই জনা।'

'না।'

'তবে তুমি কে?'

'সুলতা মিত্র।'

'মিথ্যে কথা।'

'না, মিথ্যে না।'

বাঁশ আর শাল কাঠের আড়তের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের ফালি দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছে হল, গলা টিপে ধরি কস্তুরীর... শ্বাসরোধ করে দিয়ে শেষ করে দিই সব কিছুর।

'তুমিই কস্তুরী। প্রমাণ— দুর্গা হোটেলে গিয়ে খাতায় নাম লিখিয়েছিলে— উমা দেবী।'

'লিখিয়েছিলাম শুধু তোমার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে।'

'চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে? অর্থাৎ যাতে আর তোমাকে কোনওদিন খুঁজে না পাই?'

'হ্যাঁ... তা-ই। তোমার যখন দৃঢ় বিশ্বাস যে আমিই উমা দেবী, তখন আমি উধাও হলে ওই নামেই খোঁজ নিতে তুমি। তাহলেই খুঁজে পেতে উমা দেবীর নাম... উধাও হয়ে যেতো সুলতা মিত্র... সুলতা মিত্রকে ভুলে গিয়ে যাতে কস্তুরী কৌশিকের স্মৃতি নিয়ে তুমি থাকতে পারো— সেই ব্যবস্থাই করছিলাম আমি।'

'কস্তুরীর মতো চুল বেঁধেছ কেন?'

'একই কারণে। শ্লেট থেকে সুলতাকে মুছে ফেলতে চাই। কস্তুরী ছাড়া আর কারও নাম থাকবে না সেখানে।'

'কিন্তু আমি তোমাকেই রাখতে চাই।'

নিশ্চুপ রইল সুলতা।

'পালাচ্ছিলে কেন? আমার সঙ্গ কি এতই যন্ত্রণাদায়ক?'

'সত্যিই তা-ই।'

'আজেবাজে প্রশ্ন করি বলে?'

'হ্যাঁ... তা ছাড়া... আরও কারণ আছে।'

'যদি কথা দিই যে এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করব না?'

'হায়রে! কথা দিয়েও কি রেখেছ কোনওদিন?'

'শোনো... স্বীকার করো তুমিই কস্তুরী, জীবনে আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোনও কথা বলব না আমি... নতুন করে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধব, সুখী হব দু-জনেই।'

'আমি কস্তুরী নই।'

আবার। আবার সেই অসহ্য একগুঁয়েমি!

'চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তুমি কস্তুরী... কোনওখানে কোনও তফাত নেই।'

'হতে পারে। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে রেহাই দাও... আমার নিজেরও অনেক দুশ্চিন্তা আছে।'

'কীসের দুশ্চিন্তা?'

'সব দুশ্চিন্তা কি সবাইকে বলে হালকা হওয়া যায়?'

কাঁদছে সুলতা। শুধু গলাই ধরেনি, চোখও ভিজেছে। রুমাল বার করে সযত্নে চোখ মুছে দিলাম ওর।

হোটেলে যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধে হয়েছে। আলো-ঝলমল পোর্টিকো পেরিয়ে ডাইনিং রুমে ওমলেটের অর্ডার দিয়ে বসে পড়লাম কোণের টেবিলে।।

সুলত বসল না। বলল, 'আমার ক্ষিদে নেই... মাথা ধরেছে... প্লিজ।'

টেনে বসালাম পাশের চেয়ারে। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ... কস্তুরীর মুখ... মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল অসম্ভব... পরক্ষণেই ভাবলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না তো!

আধখানা ওমলেটও শেষ করতে পারল না কস্তুরী। লক্ষ করলাম, খেতে খেতে বেশ কয়েকবার স্বপ্নালু হয়ে উঠেছে ওর দুই চোখ— চার বছর আগে স্বপ্নবিভোর এ দৃষ্টি কতবার কতদিন দেখেছি আমি। পর পর তিনটে হুইস্কি শেষ করে ফেললাম আমি। তখন মুখ নিচু করে আত্মবিভোর হয়ে রইল কস্তুরী।

চতুর্থ পেগটা ঠোঁটের কাছে তুলে বললাম, 'দেখতে পাচ্ছি, শেষ হতে চলেছে তোমার অন্তর্দ্বন্দ্ব... কস্তুরী, এবার কথা বলো।'

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল কস্তুরী।

'আসছি আমি,' বলে চুমুক দিলাম গেলাসে। এক নিঃশ্বাসে সবটা শেষ করে দিয়ে সিঁড়ির গোড়াতেই ধরে ফেললাম ওকে। সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে, ঘাড় কাত করে ফিসফিস করে বললাম কানের কাছে, 'স্বীকার করো কস্তুরী, স্বীকার করো।'

রেলিংয়ের ওপরে বসানো ব্রোঞ্জের কিউপিড মূর্তিটার ওপর মাথা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুলতা। বলল, ‘হ্যাঁ, আমিই কস্তুরী!’

(৬)

য. চালিতের মতো চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম দরজা। এই সেই স্বীকারোক্তি, যার প্রতীক্ষায় দীর্ঘ চার বছর কী অপরিসীম কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু কই, রহস্যের জট সরল হওয়া দূরে থাকুক, এ যে আরও জটিল হয়ে উঠল। এ কি সত্যিই স্বীকারোক্তি? এমন সহজভাবে বলল কস্তুরী! হয়তো আমাকে খুশি করার জন্যই বানিয়ে বলেছে— শান্তিতে থাকার শেষ প্রচেষ্টা।

দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে শুধোলাম, 'প্রমাণ?'

'চাই নাকি?'

'না... কিন্তু...'

ঘাবড়ে গেলাম আমি। হায় ভগবান! ভয় কি আমার স্নায়ুমণ্ডলীতে মৌরসী পাট্টা গেঁড়েছে! এত দুর্বল কেন আমি!

'আলোটা নিভিয়ে দাও!' মিনতি করে বলে কস্তুরী।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ল ঘরের দেয়ালে, সিলিংয়ে। রাস্তার ল্যাম্পের আলো। ফাঁক ফাঁক আলো আর অন্ধকারের গরাদ। গরাদ! তা-ই বটে! খাঁচায় বন্দি— দু-জনেই! খাটের ওপর এলিয়ে পড়ি আমি।

'একথা আগে বলোনি কেন? কীসের ভয়?'

দেখতে পাচ্ছিলাম না কস্তুরীকে— অন্ধকারের মধ্যে শুনলাম বাথরুমের মধ্যে ওর নড়াচড়ার শব্দ।

'উত্তর দাও, কার ভয়ে মুখবন্ধ করেছিলে এতদিন?'

নিরুত্তর রইল কস্তুরী।

‘সেদিন হোটেলে আমাকে দেখেই তুমি চিনতে পেরেছিলে, তা-ই নয়?’

‘হ্যাঁ।’

‘তক্ষুনি সব স্বীকার করলেই গোল চুকে যেত, এত ছলনার কী দরকার ছিল! এ-রকম আহাম্মকি করলে কেন?’

প্রবল ঘুষিতে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল খাটের স্প্রিং।

‘কী বোকা!... এ বয়সে এ-রকম উজবুকি শোভা পায়?... তার ওপর ওই চিঠিটা!... সোজাসুজি না বলে চিঠি লেখার প্রয়োজন হল কেন?’

পাশে এসে বসল কস্তুরী।

‘তোমাকে কোনওদিনই একথা জানতে দিতে চাইনি আমি।’

‘কিন্তু আমি তো আগাগোড়াই জানতাম যে...’

‘শোনো... খুলে বলতে দাও আমাকে... বলতে কষ্ট হচ্ছে... তবুও বলতে দাও।’

হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে কস্তুরীর! আড়ষ্ট হয়ে রইলাম আমি। দেহের সমস্ত মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। এবার শুনব সেই ভয়াবহ তথ্য... যে গূঢ় রহস্যের জন্যে... কিন্তু ভয়ে শিউরে উঠছি কেন আমি?

‘কলকাতায় যে মেয়েটিকে তুমি চিনতে, নিউ এম্পায়ারে তোমার বন্ধু মহেন্দ্রর সঙ্গে যাকে দেখেছিলে, যার পিছু নিয়েছিলে তুমি দিনের পর দিন, যাকে তুমি টেনে তুলেছিলে জলের মধ্যে থেকে— সে মরেনি... কোনওদিনই মরেনি। বুঝেছ? আমি কোনওদিনই মরিনি।’

হাসি পেল আমার। বললাম, ‘না, তুমি মরোনি... শুধু যা রাতারাতি সুলতা মিত্র হয়ে গেলে।’

‘না গো না... তাহলে ভালোই হত! কিন্তু আমি সুলতা মিত্র হইনি, চিরকালই ছিলাম। আমার আসল নাম, সুলতা মিত্র। আর এই সুলতা মিত্রকেই আগাগোড়া ভালোবেসে এসেছ তুমি।’

‘কী বলতে চাও তুমি?’

কস্তুরী কৌশিককে তুমি কোনওদিনই দেখোনি। আমিই তার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। আমি ছিলাম মহেন্দ্র কৌশিকের দুষ্কর্মের সঙ্গিনী... ওগো, যদি পারো ক্ষমা কোরো! জানো, এজন্যে কী কষ্ট পেতে হচ্ছে আমাকে?’

সজোরে কস্তুরীর কবজি চেপে ধরলাম আমি।

'বুরুজের নীচে যে দেহ আছড়ে পড়েছিল, তুমি বলতে চাও তা...'

'হ্যাঁ, কস্তুরী কৌশিকের। একটু আগেই স্বামীর হাতে খুন হয়েছিল সে... মরেছে শুধু কস্তুরী কৌশিকই... বেঁচে রয়েছি আমি... বুঝেছো!'

'মিথ্যে কথা, বিশ্বাস করি না আমি। বলাটা খুবই সহজ, বিশেষ করে মহেন্দ্র আর বেঁচে নেই যে এসে তোমার এই গালগল্পের সত্যতা যাচাই করবে। তুমি তাহলে মহেন্দ্রর রক্ষিতা ছিলে, কেমন? বেচারার বউকে মারার জন্যে গোটা প্লটটা তোমার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। কিন্তু কেন?'

'ওর টাকা ছিল বলে আমরা বিলেত যাওয়ার প্ল্যান করেছিলাম।'

'চমৎকার! তা-ই যদি হয়, তবে বউকে নজরে রাখার জন্যে মহেন্দ্র আমাকে সাধাসাধি করেছিল কেন?'

'উত্তেজিত হয়ো না।'

'আমি হইনি; জীবনে এত শান্তভাবে কথা বলিনি আমি। বলো কেন?'

'সন্দেহকে বিপথে চালিয়ে দেওয়ার জন্যে; আত্মহত্যা করার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণই ছিল না মহেন্দ্র কৌশিকের স্ত্রীর। কাজেই এমন একজনকে খুঁজছিলেন ভদ্রলোক, যে কিনা সময় হলেই এগিয়ে এসে বলতে পারবে, হ্যাঁ, উদ্ভট ভাবনা-চিন্তা গজগজ করত কস্তুরী কৌশিকের মাথায়, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত সে পূর্বজন্মের সবকিছুই তার নখদর্পণে, মৃত্যু তার কাছে খুব একটা বড় ব্যাপার নয়— খেলার মতোই; এমন একজনকেই দরকার ছিল, যে বলতে পারবে, হ্যাঁ, আমি দেখেছি, কস্তুরী কৌশিককে এর আগে আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করতে... তুমি উকিল মানুষ... তা ছাড়া তোমার নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা... গোটা গল্পটাই যে তুমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করবে, তা জানতেন তিনি।'

'বটে! আমার মতোই একটা নিরেট গর্দভকে খুঁজছিল সে! শুধু নিরেট কেন, স্ক্রু আলগা থাকাও দরকার ছিল, কেমন? কী নিখুঁত প্ল্যান! তাহলে থিয়েটারে যাকে দেখেছিলাম, সে তুমি; উমা দেবীর সমাধির সামনে যে গিয়েছিল, সে-ও তুমি; মহেন্দ্রর ঘরে যার ফোটোগ্রাফ দেখেছিলাম, তা-ও তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর নিশ্চয় বলবে, উমা দেবী বলে কস্মিনকালে কেউ ছিল না?'

‘ছিল।’

‘ও! অর্থাৎ এটুকু আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না।’

‘প্লিজ, একটু বোঝবার চেষ্টা করো।’ দীর্ঘশ্বাস শুনলাম।

‘বেশ বুঝছি আমি, জলের মতো বুঝছি। এও বুঝছি যে এমন খাসা একটা গল্পকে কাঁচিয়ে দিচ্ছে একা উমা দেবীই।’

‘গল্প হলে তো বাঁচতাম,’ বিড়বিড় করে বলে কস্তুরী, ‘উমা দেবী সত্যি সত্যিই কস্তুরী কৌশিকেরই পূর্বপুরুষ। সত্যি কথা বলতে কি, উমা দেবীর কাহিনি শুনেই মতলবটা তোমার বন্ধুর মাথায় এসেছিল। পূর্বপুরুষের আত্মার ভর হওয়া, সমাধিস্থানে বার বার যাওয়া, উমা দেবীও তো জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন— তাই আত্মহত্যার অভিনয়...’

‘অভিনয়?’

‘তা ছাড়া আর কী? জল থেকে তুমি আমাকে না তুললেও আমি ডুবতাম না। সাঁতারে আমি বরাবরই ভালো।’

হাত নিশপিশ করে উঠল আমার— পাছে কিছু একটা করে ফেলি সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি খামচে ধরলাম বিছানায় চাদর।

কিন্তু রোষ চাপা রইল না কণ্ঠে, ‘সাবাস মহেন্দ্র, খুব ঘুঘুর খেল দেখালে! কিছুই ভাবতে বাকি রাখোনি! আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করার সময়ে মহেন্দ্র নিশ্চয় জানত যে আমি যাব না?’

‘ঠিক তা-ই। তুমি যেতে চাইলে না। পরে আমিও তোমাকে বাড়িতে ফোন করতে বারণ করে দিলাম।’

‘তা মন্দ নয়... চমৎকার... কিন্তু ওই বুরুজ? আমরা যে ওই বুরুজে যাবে, তা ও জানল কী করে? বুঝেছি... ড্রাইভ করেছিলে তুমি, শ্যামনগরের নির্জন নীলকুঠি আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল, ঠিক কখন গিয়ে পৌঁছবে, তাও নিখুঁতভাবে হিসেব করেছিলে... মহেন্দ্র শুধু নিজের বৌকে ঠিক তোমার মতোই সাজিয়ে আগে থেকেই হাজির ছিল বুরুজের চুড়োয়... সমস্তই মিলে যাচ্ছে... তবুও আমি বিশ্বাস করি না... একটা কথাও বিশ্বাস করি না তোমার... মহেন্দ্র খুনি নয়... কখনওই নয়।’

‘তিনিই খুনি। খুন না করে উপায়ও ছিল না। বিয়ে করে সুখী হননি ভদ্রলোক। কস্তুরী সত্যি সত্যিই রুগ্ন ছিল... বুঝতেই পারছ রোগটা কীসের... অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন

তোমার বন্ধু, ফল হয়নি কিছুই... কারও বিধানই সঠিক হয়নি... অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন মহেন্দ্রবাবু...'

'এবার সব পরিষ্কার হয়ে আসছে! বুরুজ নিয়ে আর কোনও সমস্যা নেই। আগে থেকেই চুড়োয় উঠে বসেছিল মহেন্দ্র, বউকে খুন করে মুখখানা এমন বিকৃত করে রেখেছিল যাতে কেউই চিনতে না পারে— তারপরেই গাড়ি হাঁকিয়ে পৌঁছে গেলে তুমি। মহেন্দ্র জানত আমার ব্যায়রাম, উঁচুতে উঠতে পারি না... দরজাটা সেই কারণেই পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে... আমাকে কেটে ফেললেও আলসে দিয়ে যেতে পারতাম না... ইতিমধ্যে তুমি উঠে গেলে ওপরে... ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মরা বউকে বাইরে ঠেলে ফেলে দিলে মহেন্দ্র, তুমিও বুকফাটা গলায় চেঁচিয়ে উঠলে। তারপর? তারপর তোমরা ঝুঁকে দেখতে লাগলে কীভাবে টলতে টলতে আমি এগিয়ে গেলাম লাশটার দিকে। হুবহু তোমার মতোই শাড়ি-ব্লাউজ পরে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা, চুলও বেঁধেছিলেন একই ঢঙে!... দেখছ, তুমি বলবার আগেই সব বলে দিচ্ছি আমি! আমাকে আচ্ছন্নের মতো চলে যেতে দেখে তোমরা...'

হাঁপাচ্ছিলাম আমি। স্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাহিনিটা সেঁধিয়ে যাচ্ছে মগজের মধ্যে... অজস্র খুঁটিনাটিগুলোও খাঁজে খাঁজে বসে গিয়ে ধাপে ধাপে ক্লাইমাক্সের দিকে নিয়ে চলেছে ভয়ংকর বিয়োগান্তক নাটকটিকে।

'আমার উচিত ছিল চেঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করে পুলিশ ডাকা। মহেন্দ্রও তাই হিসেব করে রেখেছিল— পুলিশের কাছে আত্মহত্যার একটা জমকালো বিবরণ দেব। এই আশাই সে করেছিল আমার কাছে। গ্রামে লোকজন ডাকতে যাওয়ার সময়ে তোমরা নেমে এসে সরে পড়তে— কেমন তা-ই নয়? খাসা মতলব! কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিলাম আমি। চেঁচামেচির ধার দিয়েও গেলাম না। নিজে জ্বলে পুড়ে মরছি শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে, একটু আগে একটা মেয়েকেও মরবার সুযোগ করে দিয়েছি— সেই দুর্বলতাকে ঢাক পিটিয়ে দুনিয়ার সামনে জাহির করতে চাইনি আমি। ফেঁসে গেল মহেন্দ্রর পরিকল্পনা। ও কল্পনাই করতে পারেনি একদম বোবা হয়ে যাব আমি— যে লোক এর আগেও একবার নিজের জায়গায় আর একজনকে মরতে দিয়েছে, তার পক্ষে এই আত্মযন্ত্রণা আর নীরবতা হয়তো অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু...'

না, কোনও ভুলই হয়নি আমার, এই একটি জায়গাতেই কেঁচে গেল অমন চমৎকার প্ল্যানটা। মনে পড়ল সেই ভয়াবহ রাতে মহেন্দ্রর প্রাসাদে গিয়ে কী পরিমাণ আতঙ্ক দেখেছিলাম বন্ধুর চোখে মুখে, কিছু বলতে পারেনি সে, বলার উপায়ও ছিল না। পরের দিন সকালে ফোন করেছিল মহেন্দ্র, 'যা ভয় করেছিলাম, কস্তুরী আত্মহত্যা করেছে... পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে... যাই হোক, আমার সঙ্গে তুমি থাকলে স্বস্তি পেতাম...'

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করেছিল মহেন্দ্র যাতে নাটকের শেষ অংশটুকু আবার আমি অভিনয় করি। ঠিক। আমার নীরবতাই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ছকটার। তারপরেই পুলিশ মহেন্দ্রকে নিয়ে পড়েছে। কেননা, আত্মহত্যার কোনও কারণ ছিল না মিসেস কৌশিকের, অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি, তাঁর মৃত্যুতে সব টাকাই পাচ্ছে মহেন্দ্র, কাজেই পুলিশের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, তার ওপর গাঁয়ের লোকেরা সস্ত্রীক মহেন্দ্রকে গাড়ি করে যেতেও দেখেছে সত্যিই, খুব বেকায়দায় পড়েছিল বেচারি। তারপরেই স্ত্রী-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল মোটর অ্যাকসিডেন্টে নিজে মরে।

বালিশে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছিল সুলতা। আচম্বিতে উপলব্ধি করলাম, সব যন্ত্রণার অন্তে পৌঁছেছি আমি। শেষ, শেষ, সব শেষ। দু-চোখ খুলে এতদিন আমি দুঃস্বপ্নের ঘরে দিন যাপন করেছি... শয্যাসঙ্গিনী এই স্ত্রীলোকটিই তাহলে সুলতা... মহেন্দ্রর সঙ্গেও বোধ করি এই বাড়িতে রাত কাটিয়েছে সে, তখনই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দু-জনে... দুর্বল মুহূর্তে মত দিয়েছে মহেন্দ্রর মতলবে, রাজি হয়েছে ছকমাফিক নাটকে অভিনয়ে, দীর্ঘ চার বছর পরে আবার আর এক দুর্বল মুহূর্তে এই অভিশপ্ত গৃহেই স্বীকার করল সে সব কিছু, উজার করে ঢেলে দিল সঞ্চিত দুঃখ, পাপ আর অন্যায়বোধের স্তূপ... এক হতভাগ্য নির্বোধ অসুস্থ উকিলকে ফাঁদে ফেলার করুণ কাহিনি, তাকে সং সাজানোর হাস্যকর কাহিনি... না... না... আমি বিশ্বাস করি না... এক বর্ণও বিশ্বাস করি না... কখনওই করি না... সমস্ত মিথ্যে... আমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আগাগোড়া বানিয়ে বলেছে মায়াবিনী কুহকিনী... আমাকে ভালোবাসে না সুলতা... কস্তুরী... কোনওদিনই বাসেনি... চার বছর আগেও না... পরেও না...

'কস্তুরী!' তীব্র চাপা স্বরে হিসহিসিয়ে উঠেছিলাম।

চোখ মুছে মাথা তুলে মুখের ওপর থেকে পেছনে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে জবাব দিলে ও, 'আমি কস্তুরী নই।'

পর মুহূর্তেই দাঁতে দাঁত পিষে শক্ত মুঠিতে টিপে ধরলাম কস্তুরীর গলা।

যেন একটা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ নিঃসীম আক্রোশে গর্জে উঠেছিল আমার কণ্ঠে। ভয়াল দামামা বেজে উঠেছিল মস্তিষ্কের কোষে কোষে, লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখা নৃত্য করে উঠেছিল প্রতিটি রক্ত কণিকায়।

'মিথ্যেবাদী... আগাগোড়া মিথ্যে বলে আসছ তুমি... কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, বুঝতে পারছ না, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরকাল বেসেছি— উমা দেবী, সমাধি আর তোমার ওই স্বপ্নছাওয়া পাগল করা চোখের জন্যে সেই প্রথম দিনটি থেকে তোমাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসে এসেছি। একটা সুন্দর ফুলকে, তার সৌরভকে মানুষ যেমন নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, আমার এই ভালোবাসাও তেমনি নিখাদ নির্লোভ... যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি, তোমাকে স্পর্শ করেছি, সেই দিন থেকেই জেনেছি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র নারী... আর কেউ নেই... ছিল না... থাকবে না... কস্তুরী... মনে পড়ে মিউজিয়ামে যাওয়া? বিটি রোড বরাবর গাড়ি চালানো?... দুধসাগরের পাড়ে... ফুল... গঙ্গার তীর... স্বপ্নে দেখা সেই গ্রাম... কস্তুরী। দোহাই তোমার, সত্যি বলো।'

নিথর হয়ে রইল কস্তুরী। অসীম যন্ত্রণায় গলা থেকে আঙুল সরিয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলাম।

পরক্ষণেই আমার বিকট আর্ত-চিৎকারে হোটেলের সব ক-টা ঘর খালি করে লোকজন ছুটে এল দরজার সামনে।

অনেক আগেই কান্না বন্ধ হয়ে গেছিল আমার। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম শয্যার পানে। হাতকড়ি না থাকলেও বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করে রাখতাম আমি। পুরীতে বন্ধুর কাছে লেখা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর মল্লিকের চিঠিখানা সবে পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

'চলুন।'

লোক গিজগিজ করছিল ঘরের ভেতরে— কারও মুখে এতটুকু শব্দ নেই।

বিড়বিড় করে বলেছিলাম, 'কস্তুরীর কাছে একবার যেতে পারি?'

নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলেন ইন্সপেক্টর। মেপে মেপে পা ফেলে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নিষ্প্রাণ তন্বী দেহে আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য, মুখে অপরিসীম প্রশান্তি। ভয়

হল, পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়। তাই আলতো করে অধরের ছোঁয়া দিলাম... আইভরির মতো শুভ্র ললাটে।

বললাম গাঢ় স্নিগ্ধ কণ্ঠে, ‘আবার দেখা হবে।’

পরিচিতি
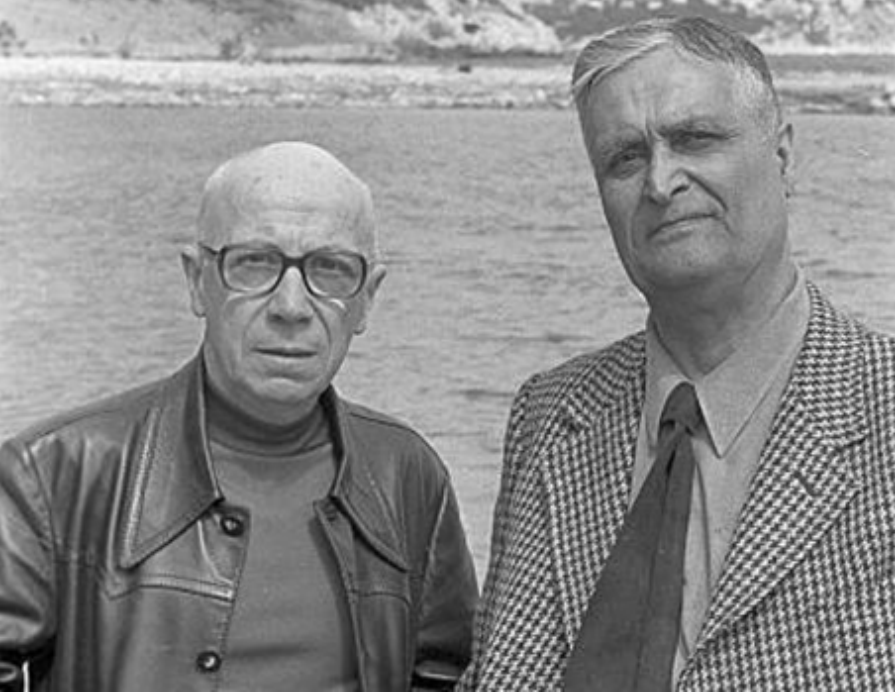
বোলিউ-নার্সেজ্যাক

বোলিউ-নার্সেজ্যাক এই ছদ্মনামের আড়ালে বিংশ শতাব্দীর মনস্তাত্ত্বিক রহস্য গল্পের ক্যানভাসে বহু বিচিত্র প্লটের বর্ণালী বীক্ষণ করে গেছেন অন্যতম সেরা ফরাসি লেখক জুটি পিয়ের বোলিউ এবং পিয়ের অরো (ওরফে টমাস নার্সেজ্যাক)। 'Le roman de la victime' (The victim novel) অর্থাৎ গোয়েন্দা গল্পের প্রচলিত কাঠামোর পরিবর্তে রহস্যের উৎকেন্দ্র এবং দ্রষ্টার অভিমুখের কম্পাস শলাকা কিছুটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেখানে রহস্যের মোড়ক উন্মোচিত হবে এই ট্র্যাজেডির বলি যে তারই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এই ধারার প্রবক্তা ছিলেন এঁরা। এই দুই জুটি লিখেছেন ৪৩টি উপন্যাস, ১০০র বেশি ছোটগল্প এবং চারটি নাটক। তাঁদের লেখা প্রচুর সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক হেনরি জর্জেস ক্লুসোর পরিচালনায় জগদ্বিখ্যাত ফরাসি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার 'Les Diaboliques' এবং আলফ্রেড হিচককের পরিচালিত জেমস স্টুয়ার্ট এবং কিম নোভাক অভিনীত ১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'ভার্টিগো'।

আলফ্রেড হিচকক

স্যার আলফ্রেড জোসেফ হিচকক ছিলেন গত শতাব্দীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজক। সাসপেন্স ছায়াছবি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অগ্রগণ্য, রহস্যের অন্দরে চূড়ান্ত গা ছমছমে আবহ তৈরির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ১৯২৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য প্লেজার গার্ডেন' থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সালে 'ফ্যামিলি প্লট' পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রাপথে হিচকক সাহেব পঞ্চাশেরও বেশি ছায়াছবি পরিচালনা করেন, যার অনেকগুলোই সাধারণ দর্শক এবং বিদগ্ধ সমালোচক দুই মহলেই উচ্চ-প্রশংসিত হয়। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ এই ভদ্রলোক প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা নিয়েও আগ্রহী হয়ে পড়েন চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রতি। বিশেষ করে জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট জাতীয় ছায়াছবি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এই সূত্রে উল্লেখ্য যে বিখ্যাত জার্মান পরিচালক ফ্রিৎজ ল্যাং পরিচালিত ১৯২১ সালের অন্যতম ছায়াছবি 'ডেস্টিনি' তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছিল গভীরভাবে। ১৯২৭ সালের ছবি 'দ্য লজার: আ স্টোরি অব দ্য লন্ডন ফগ' থেকে তাঁর ছবি নজর কাড়তে শুরু করে সমালোচকের এবং সাসপেন্স থ্রিলার ছায়াছবির ক্ষেত্রে হিচকক এই নাম প্রায় সমার্থক

হতে শুরু করে। ১৯২৯ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম ব্রিটিশ টকি অর্থাৎ সবাক ছায়াছবি ‘ব্ল্যাকমেইল’ পরিচালনার কৃতিত্বও ছিল তাঁরই। পরবর্তীকালে হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক ডেভিড সেলজনিকের প্রভাবে তিনি হলিউডে যান এবং সেই পর্বে সাসপেন্স ছায়াছবির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হয় তাঁরই পরিচালনায়। টিভিতে সাসপেন্স ধারাবাহিক হিসেবে ‘আলফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস’ এবং ‘দ্য আলফ্রেড হিচকক আওয়ার’ এক সময় সাড়া ফেলেছিল যে দুই অনুষ্ঠানের সূত্রধর ছিলেন তিনি। ‘রেবেকা’, ‘লাইফবোট’, ‘ভার্টিগো’, ‘সাইকো’, ‘দ্য বার্ডস’ এমন সব আইকনিক ছায়াছবির পরিচালক আলফ্রেড হিচকক ‘মাস্টার অব সাসপেন্স’ অভিধায় চিরস্থায়ী রয়ে গেছেন রহস্যপ্রেমী দর্শকের হৃদয়ে।
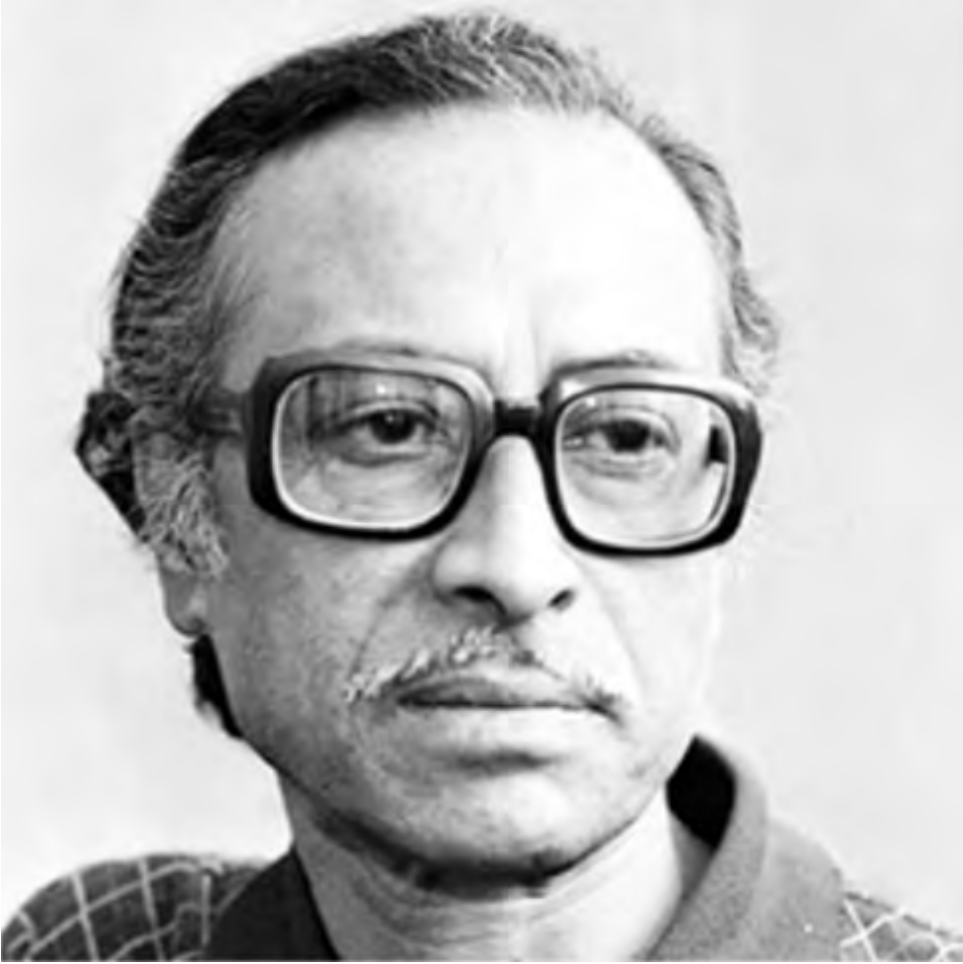
অদ্রীশ বর্ধন

জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৯৩২, কলকাতায়। একটি প্রাচীন শিক্ষাব্রতী পরিবারে। ছোট থেকেই অজানার দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ। অ্যাডভেঞ্চারের টান জীবনে, চাকরিতে, ব্যবসায়, সাহিত্যে। নামী একটি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ ম্যানেজার পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। গোয়েন্দা সাহিত্যে একনিষ্ঠ থেকে বাংলায় সায়েন্স ফিকশনকে

ত্রিমুখী পন্থায় জনপ্রিয় করতে শুরু করেন **১৯৬৩** সাল থেকে। ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'আশ্চর্য!'-র ছদ্মনামী সম্পাদক। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন 'ফ্যানট্যাসটিক'। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রোফেসর নাটবল্টু চক্র প্রমুখ চরিত্রের স্রস্টা। পেয়েছেন একাধিক পুরষ্কার। দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরষ্কার, মৌমাছি স্মৃতি, রণজিৎ স্মৃতি ও পরপর দু'বছর দক্ষিণীবার্তার শ্রেষ্ঠ গল্প পুরষ্কার। অনুবাদের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ রাহা পুরষ্কার। ভালোবাসেন লিখতে, পড়তে ও বেড়াতে।

কল্পবি. পাবলিকেশনস
পুস্তক তালিকা

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১: ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০: বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কালসন্দর্ভা: অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক: অঙ্কিতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১: আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড: হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা: বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার
লেখক: সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক: দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক: সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র: কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ: সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক: অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র: রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা: সুদীপ দেব

কল্পবিশ্বের ডিজিটাল ইবুক

কল্পবিশ্বের বইগুলি এবার পাবেন ইবুক ফরম্যাটেও। পড়তে পারবেন আপনার মোবাইল, কম্পিউটার, আইফোন, আইপ্যাড কিংবা কিন্ডল ডিভাইসে। বিশদে জানতে নিচের লিঙ্ক দেখুন।

https://bit.ly/kalpabiswa